জাপানের উন্নতি হইল কিরূপে

শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ

প্রবাসী কার্য্যালয়
১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

মূল্য দশ আনা মাত্র

১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা
প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীমাণিকচন্দ্র দাস
কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সূচী

মুখবন্ধ

১৯২৯ খৃষ্টাব্দের জুন হইতে নবেম্বর মাস পর্য্যন্ত আমি জাপানে ছিলাম। জাপানের রেশমশিল্প সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য বহু গ্রাম, শহর, রেশম কাটাই, রঙাই, বয়ন ও ধোলাই কারখানা, বিদেশে রেশমসূতা ও বস্ত্র চালান দিবার সমিতি, গবেষণা-প্রতিষ্ঠান, পরীক্ষাকেন্দ্র এবং কৃষি ও রেশম বিদ্যালয় ও কলেজ প্রভৃতি পরিদর্শন করিয়াছিলাম। সেই সঙ্গে বালকবালিকাদের সাধারণ বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়, শিল্প-বিদ্যালয়, কলেজ এবং শিল্প-বিশ্ববিদ্যালয়— নানা শিল্পের গবেষণা ও পরীক্ষা-প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি পরিদর্শন করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। ফলে, জাপানের কিরূপে এত দ্রুত উন্নতি হইয়াছে এবং আরও হইতেছে এবং এই উন্নতি কত চেষ্টা ও আয়োজনের ফল তাহার একটা স্পষ্ট ধারণা জন্মে। সেই ধারণা এই পুস্তিকার মারফতে আমার স্বদেশবাসীর গোচর করিতেছি।

জাপানকে মৌচাকের সঙ্গে তুলনা করিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। দলের প্রত্যেক মৌমাছি সারাক্ষণ সাধ্যমত পরিশ্রম করে বলিয়াই মৌমাছির দল সতেজে বজায় থাকে। মৌমাছির দল এক বৃহৎ পরিবার। জাপানীরাও মনে করে মিকাডোর কর্ত্তৃত্বাধীনে তাহারা এক বৃহৎ পরিবারভুক্ত। এই বৃহৎ পরিবার সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে চলিতেছে এবং পরিবারের প্রত্যেকে মৌমাছির ন্যায় নিজ নিজ কার্য্য ও কর্ত্তব্য সাধন করিয়া যাইতেছে। ইহারই ফলে তাহাদের এত উন্নতি সম্ভব হইয়াছে।

কৃষি এবং শিল্পই প্রকৃতপক্ষে ধনোৎপাদক। ব্যবসাও সেরূপ

নহে। ব্যবসা হইল কৃষি ও শিল্পের উৎপন্ন স্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া ক্রয়বিক্রয়। ব্যবসালব্ধ অর্থ হইতেছে এই উৎপন্ন স্থানান্তর করিবার মজুরী এবং ক্রয়বিক্রয়ের দালালি। বেশী পরিমাণ জমি লইয়া কৃষিকর্ম্ম করিতে না পারিলে উহা ব্যক্তিগত ভাবে অর্থ বৃদ্ধি ও সঞ্চয়ের উপায় হইতে পারে না। মাত্র পাঁচ-দশ বিঘার উৎপন্ন ফসল ভারতবর্ষের ন্যায় বৃহৎ দেশের বহু কৃষকের একত্রে অনেক শুনাইলেও দেশের লোকের পেটের ভাতের সংস্থান ছাড়া আর বেশী কিছু নহে। এই বিষয়ে আমাদেরই কৃষিজীবীদের মত জাপানী কৃষকদের অবস্থা। কিন্তু কৃষির নানাদিকে উন্নতি করিয়া এবং কৃষির উপযোগী উপশিল্পের বন্দোবস্ত করিয়া জাপান কৃষকদিগের অবস্থার উন্নতি করিয়াছে। রেশমকীটপালন কৃষকদিগের উপশিল্প হইলেও ইহা জাপানের প্রায় অর্দ্ধেক আয়ের উপায় হইয়াছে এবং বহু ধনিকের, বহু মধ্যবিত্ত শিক্ষিতশ্রেণীর লোকের এবং বহু শ্রমিকের জীবিকার স্থল হইয়াছে। নানাবিধ শিল্পের উন্নতির বন্দোবস্ত করিয়াই জাপান আজ ধনী হইয়াছে ও হইতেছে এবং বিদেশী বাণিজ্যও নিজেদের হাতে রাখিবার উপায় করিয়া ব্যবসালব্ধ অর্থও দেশেই রাখিতেছে। এই সকলের আভাস পাইবার জন্য পরিশিষ্টে প্রদত্ত বিবরণগুলির উপর পাঠকদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

যে সকল দেশ উন্নত হইয়াছে কৃষি এবং শিল্প উভয়ের উন্নতি দ্বারাই হইয়াছে। জার্ম্মানীর অসাধারণ শিল্পোন্নতির কথা সকলেই জানেন। কৃষিতেও জার্ম্মানী, এত উন্নত যে, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ এখন কৃষির উন্নতির জন্য জার্ম্মানীরই গঠনমূলক পন্থা অনুসরণ করিতেছে। জাপান শিক্ষা, শিল্প এবং কৃষির উন্নতির জন্য জার্ম্মানীরই পন্থা অবলম্বন করিয়া এখন নিজেই অপর দেশের আদর্শ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কৃষিজাত দ্রব্যই বহু প্রধান শিল্পের ভিত্তি, যেমন—তুলা, পাট, রেশমগুটী ইত্যাদি; ধান, গম, যব কলাই প্রভৃতি খাদ্যশস্যও বহু পরিমাণে উৎপন্ন করিতে পারিলে ইহা বিক্রয় দ্বারা প্রচুর অর্থাগম হয়। এখন এই সকল জিনিষ কেবল পল্লীর বা জেলার বা কোন একদেশের বাজারে যাচাই হইয়া বিক্রয় হয় না, পৃথিবীর বাজার এখন সকল দেশের পক্ষেই খোলা। যেখানেই যে-কোন জিনিষ উৎপন্ন হউক না তাহা যদি প্রয়োজনীয় হয়, সুচারুরূপে হয়, এবং অপর দেশের উৎপন্নের তুলনায় সস্তা হয় তবে পৃথিবীর অপর প্রান্ত হইতে লোক আসিয়া তাহা ক্রয় করিয়া লইয়া যাইবে। কৃষিজাত দ্রব্যের এবং শিল্পজাত দ্রব্যেরও কাট্‌তির জন্য চাই,—

প্রথম—গুণ। যে জিনিষ যত উৎকৃষ্ট তাহার চাহিদা তত বেশী। জিনিষ যাহাতে উৎকৃষ্ট হয় সেই দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

দ্বিতীয়—সমতা (uniformity)। জিনিষগুলি একই প্রকার হওয়া চাই। গম ধান কলাই কার্পাস পাট—যাহাই হউক, প্রত্যেকটিই একই রকমের হওয়া চাই। ভালর সহিত মন্দের মিশ্রণ হইলে ভালও মন্দের শ্রেণীতে গণ্য হয়। সুতরাং মিশ্রিত জিনিষের আদর সর্ব্বত্রই কম।

তৃতীয়—প্রাচুর্য্য। পৃথিবীর বাজারে এক সের দশ সের পাঁচ মণ দশ মণ নয়, হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মণ সরবরাহ করিতে পারা চাই।

চতুর্থ—যতদূর সম্ভব সস্তা দর। অপর দেশের তুলনায় সের-প্রতি দর যদি সিকি পয়সাও সস্তা হয় প্রতিযোগিতায় জয় হইবে।

প্রথম—এই সকল সাধনের জন্য প্রয়োজন, পরীক্ষা ও গবেষণা দ্বারা উন্নত বীজ সৃষ্টি, উৎকৃষ্ট ফসল উৎপাদন, উন্নত প্রণালীর সার ইত্যাদির দ্বারা উৎপন্ন বৃদ্ধি। কৃষির অনেক বিষয়ে পরীক্ষা ও গবেষণার পথ দেখাইয়া দিতে পারিলে আমাদের কৃষকেরাও তাহা অনুসরণ

করিতে পারে এবং উৎকৃষ্ট ফল পাইতে পারে। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্যাপারটি বুঝাইয়া দেওয়া যাইতেছে। কানাডায় গম চাষ হয় এবং গমই কানাডার ধনাগমের প্রধান উপায় বলিলেই হয়। ইহা সম্ভব হইল কিরূপে? এই দেশের গমের শত্রু হইল রাষ্ট্ নামক রোগ যাহা গাছকে নিস্তেজ করিয়া ফসল কমাইয়া দেয় এবং তুষারপাতে সমস্ত ক্ষেতই জ্বলিয়া যায়। ফাইফ নামক এক ব্যক্তি বিলাত হইতে কয়েক প্রকার গমের বীজের নমুনা আনাইয়া বপন করে। এই সকল বীজ হইতে উৎপন্ন গমের মধ্যে মাত্র একটি গাছ তাহার নজরে পড়িল যাহার রাষ্ট্‌রোগ হয় নাই এবং তুষারপাতে যাহার কোন ক্ষতি করে নাই। এই গাছটির বীজ আলাদা সংগ্রহ করিয়া এবং জন্মাইয়া ও এই বীজ হইতে গম চাষ করিয়াই কানাডা আজ ধনী হইয়াছে। এইরূপ নির্ব্বাচন দ্বারাই বহু ফসলের উন্নতি হইয়াছে। যদি এমন আক পাওয়া যায় যাহা বৎসরাধিক সময় না লইয়া ছয় মাসে পাকে, যদি ধানের গোছের সমস্ত গাছগুলিই এক সঙ্গে বাড়িয়া ফলে ও পাকে, যদি ধানের পূর্ব্বে, সঙ্গে বা শেষে অনায়াসে আর এক ফসল জন্মাইয়া লইতে পারা যায়, এইরূপ কতদিকে কৃষির আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। তবে আকস্মিক ঘটনার উপর নির্ভর না করিয়া উন্নত সকল দেশই পরীক্ষা ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছে এবং ইহা দ্বারা উন্নতি সাধন করিতেছে। আমাদের দেশেও এখন এই কার্য্য কতক পরিমাণে হইতেছে, কিন্তু প্রয়োজনানুরূপ বিস্তৃতভাবে নয়। গরু, মহিষ, ছাগল, মেষ, ঘোড়া প্রভৃতি গৃহপালিত পশুরও এইরূপ নির্ব্বাচন দ্বারা উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

দ্বিতীয়—কৃষকের অল্প সুদে ঋণ পাইবার বন্দোবস্ত। কৃষকদের মধ্যেই সমবায় ঋণসমিতির দ্বারা ইহা অপরাপর দেশে যতদূর উন্নত হইয়াছে

অন্য কোন উপায়ে তেমন হয় নাই। নিজেদের অল্প অল্প সঞ্চয় একত্র করিয়া কম সুদে যেমন ঋণের সুবিধা হয় তেমন আর কোন উপায়ে হইতে পারে না। ইহার বন্দোবস্তের সূচনা আমাদের মধ্যে হইয়াছে, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় ইহার প্রসারের চেষ্টা এখনও অতি অল্প।

তৃতীয়—সমবায় ও সহযোগে কাজ। অনেকে মিলিয়া একই প্রকার বীজ ব্যবহার দ্বারা সমান গুণসম্পন্ন বহুপরিমাণ ফসল উৎপাদন, উৎকৃষ্ট যন্ত্রপাতি ও সার সরবরাহ এবং ব্যবহার ও উৎপন্ন ফসল আবশ্যক হইলে ঝাড়াই সাফাই করিয়া নিকৃষ্ট অংশ পৃথক করিয়া একত্রে বহু পরিমাণে বিক্রয় প্রভৃতি কার্য্য। কত মাড়োয়ারী ব্যবসাদার নানা স্থানের উৎপন্ন ফসল অল্পে অল্পে সংগ্রহ করিয়া ও চালান দিয়া ধনী হইতেছে। বিখ্যাত র‍্যালি ব্রাদ্রার্স কোম্পানীর প্রধান কাজই এই। সমবায়ে বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করিতে পারিলে লাভের অর্থ কৃষিজীবীদের হাতে থাকিতে পারে।

চতুর্থ—শিক্ষা। আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত এবং পরীক্ষা ও গবেষণ দ্বারা নির্ব্বাচিত ও নির্দ্ধারিত উৎকৃষ্ট প্রণালী শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়, পরীক্ষাক্ষেত্র, পত্রিকা প্রচার ও বক্তৃতাদির বন্দোবস্ত।

শিল্প সম্বন্ধেও এই একই পন্থা কার্য্যকরী। কৃষি এবং বিশেষ করিয়া শিল্পের উন্নতি করিতে না পারিলে বাঙ্গালী দরিদ্র থাকিবে। কৃষি এবং শিল্পোন্নতির সহিত ব্যবসাও প্রয়োজন। এই তিনেরই প্রসার ও উন্নতি না হইলে দেশের আর্থিক জীবন অসম্পূর্ণ থাকে, যেমন, আমরা শিল্পে ও ব্যবসায়ে পরাধীন হইয়াছি। কৃষিজাত দ্রব্য দ্বারা শিল্প স্থাপন করিতে পারিলে কৃষিকার্য্যের অবসর সময়ে অনেক বেকার কর্ম্মীর কাজ মিলে। ফলে, তাহারা কর্ম্মের উদ্দেশে বিদেশে বা স্থানান্তরে যাইতে বাধ্য হয় না এবং কৃষি ও শিল্প দুইই কর্ম্মীর অভাব অনুভব

করে না এবং মজুরীও অযথা বেশী দিতে হয় না। কৃষি, শিল্প এবং শিল্পজাত দ্রব্যের ব্যবসা দ্বারা বহু শিক্ষিতের অন্নসংস্থান হয়। জার্ম্মানীতে শীতকালে বীট চিনির কারখানা চলে, আলুচাষের পর আলু শুকাইবার এবং স্পিরিট ও ষ্টার্চ তৈয়ারির কাজ চলে। জাপানে রেশম কাটাই কারখানায় কত লোক কাজ পায়। বর্ত্তমান অবস্থায় বাঙ্গালীদিগকে গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী না হইয়া নিজের চেষ্টায় এই সকল না করিলে গত্যন্তর নাই। আমেরিকা, জার্ম্মানী, ফ্রান্স, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে শিক্ষিত লোকেরা নানাপ্রকার শিল্প গ্রহণ করিয়াছে। শিল্পীরা শিক্ষিত হইয়াছে বলাও চলে। ফলে, শিক্ষার গুণেই গবেষণা দ্বারা উন্নত ও দ্রুত যন্ত্রপাতি তৈয়ারী করিয়া, উন্নত প্রণালী উদ্ভাবন করিয়া এবং বাহিরের বাজারের সহিত সম্পর্ক রাখিয়া ও বুঝিয়া এত দ্রুত শিল্পের প্রসার করিতে পারিয়াছে।

এখন বাঙ্গালীদের অবস্থা কি? চাকুরি ধনোৎপাদক নহে। একমাত্র কৃষিই এখন বাঙ্গালার ধনোৎপাদনের উপায়; তাহাও উপেক্ষিত। কৃষিজীবী পরিবারের লোকও শিক্ষা পাইলেই চাকুরির দিকে ধাবমান। একটু চিন্তা করিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন যে, আমরা কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা দ্বারা ধন উৎপাদন ও আমদানীর চেষ্টা করিতেছি না। নিজেদের মধ্যে যে যেমন করিয়া পারি পরস্পরকে শোষণ করিতেছি আর শোষিত অর্থ বিলাসিতা দ্বারা বিদেশে প্রেরণ করিতেছি। আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালী আমাদিগকে শোষকশ্রেণীতে পরিণত করিয়াছে এবং ইহার বিশেষত্ব এই যে, আমরা নিজেরা নিজেদের শোষক। জমিদারী সেরেস্তার কর্ম্মচারীরা, জেলা, মহকুমা, থানার আমলা উকিল মোক্তার পেয়াদা গ্রামবাসীদের অর্থ শোষণ করিতেছে। বড় বড় শহরে উকিল, ব্যারিষ্টার, ডাক্তারও তাহাই

করিতেছে। ইঞ্জিনিয়ার, ওভারসিয়ার, ঠিকাদার ব্যক্তিবিশেষের না হইলেও দেশের লোকের অর্থ কিছু-না-কিছু শোষণ করিয়া বড়মানুষ হইলেই জীবন সার্থক বোধ করিতেছে। সরকারী কর্ম্মচারীদের উচ্চ-বেতন—শোষণ ছাড়া আর কিছুই নহে। এত উচ্চ বেতন ভারতবর্ষের মত দরিদ্র অপর কোন দেশে ত নাই-ই, অপর কোন ধনী দেশেও নাই। ফলে দেশ যে দরিদ্র হইবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি? আমার বেশ স্পষ্ট ধারণা হইয়াছে যে, বাঙ্গালী বুদ্ধিতে পৃথিবীর অপর কোন জাতি অপেক্ষা হীন নহে। শিক্ষার অভাবে ও দোষে আমাদের কতকগুলি গুণের অভাব হইয়াছে, তাই দোষ বাড়িয়া চলিয়াছে। যদি এখন বাঙ্গালী নিজেদের ভিতর পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস ও দ্বেষ দূর করিয়া সহানুভূতি ও বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে আর সমবায়ে ও সহযোগে সকল কার্য্য করিবার অভ্যাস গ্রহণ করিতে পারে তাহা হইলে আমাদের অল্পদিনেই উন্নতি সম্ভব। শিক্ষা ও চেষ্টা ঠিক পথে চালিত হইলে আমাদের উন্নতিতে কোন বাধা জন্মিবে না।

ইংলণ্ডই প্রথমে শিল্পোন্নতি করে এবং ইহা দ্বারা বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিল। শিল্প কারখানায় কার্য্য পাওয়াতে কৃষক-শ্রেণী কৃষিকার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছিল। ফলে হইয়াছে কি? দেশের কর্ষণযোগ্য ভূমির প্রতি শত বিঘার মধ্যে প্রায় সত্তর বিঘা এখন ময়দানে পরিণত হইয়াছে। কারখানায় শিশুকাল হইতে কার্য্য করায় এই সকল লোক কৃষিকার্য্যে অনুপযোগী হইয়া গিয়াছে। এদিকে অপরাপর দেশ শিল্পোন্নতি করিয়া পূর্ব্বে যে সকল বাজার ইংলণ্ডের একচেটিয়া ছিল তাহার অধিকাংশ দখল করিয়া ফেলিয়াছে। কাজেকাজেই ইংলণ্ডের বহু শ্রমিক কাজ হারাইয়াছে এবং এখন গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত ভিক্ষা বা dole দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ

করিতেছে। এই dole বা ভিক্ষা প্রদানের জন্য অর্থ ধনিক ও মধ্যবিত্ত লোকের উপর কর বসাইয়া সংগৃহীত হইতেছে। ইংলণ্ডে প্রবাসকালে অনেকেই আমাকে বলিয়াছিলেন যে, গবর্ণমেণ্ট এই ভিক্ষা দিয়া লোকগুলিকে অকর্ম্মণ্য করিতেছে। কারণ কাজ নাই বলিয়া ঘরে বসিলেই যখন খাইবার জন্য dole পাওয়া যায় তখন কাজ খুঁজিবে কে।

এই অবস্থার সহিত জাপানের অবস্থার তুলনা করিলে দেখিতে পাই, জাপান শিল্পোন্নতি দ্বারা কর্ম্মীদিগকে কৃষি হইতে বিচ্ছিন্ন করে নাই। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের সহিত শিল্প-প্রতিযোগিতায় জাপানের সাফল্যের প্রধান সহায় হইতেছে বালিকা শ্রমিক কর্ম্মিগণ। ইহারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠ সমাপ্ত করিয়া প্রায় চৌদ্দ-পনর বৎসর বয়সে কারখানায় আসে এবং দুই, তিন বা চারি বৎসর কাজ করিবার পর সকলেই গৃহে ফিরিয়া বিবাহ করিয়া সংসারযাত্রা আরম্ভ করে এবং নূতন বালিকারা আসিয়া কারখানায় ইহাদের স্থান পূরণ করে। রেশম ও রেয়ন বয়ন এবং অপর নানাবিধ শিল্প গৃহশিল্পের মত গঠিত ও চালিত হইতেছে। Industrialism বা কারখানা-শিল্পের দোষ জাপান যতটা সম্ভব দূরে রাখিয়াছে এবং রাখিবার চেষ্টা করিতেছে।

কৃষিকার্য্য শিল্পকার্য্য অপেক্ষা শ্রমসাধ্য। কৃষক-সন্তান অল্পবয়স হইতে এই শ্রমের মধ্যে লালিতপালিত ও অভ্যস্ত হয় বলিয়া এই শ্রম কষ্টকর বলিয়া মনে করে না। একবার কৃষিকার্য্য হইতে কৃষকের মন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলে পুনরায় কৃষিতে নিযুক্ত হওয়া কষ্টকর। কৃষককে কৃষি হইতে বিচ্ছিন্ন করা অবিবেচনার কার্য্য। আমাদের লোক-সম্বল এত বেশী যে, আমরা কৃষির উন্নতি করিয়াও শিল্পের উন্নতির

জন্য লোকের অভাব বোধ করিব না। অপর পক্ষে, এখন যে সকল লোকের অন্ন জুটিতেছে না শিল্প দ্বারা তাহাদের অন্নসংস্থান হইবে। আমাদের দেশে কৃষি ও শিল্পের প্রতিযোগিতার সম্ভাবনা এখনও অনেক দূরে। শিল্পোন্নতির চেষ্টায় জাপান বহুপরিমাণে আমাদের আদর্শ। কৃষির উন্নতির জন্যও অপর দেশ অপেক্ষা জাপান হইতেই (এবং চীন হইতেও) আমাদের অনেক শিখিবার আছে। কিন্তু বিদেশীর পক্ষে জাপানে শিক্ষার বিশেষ বাধা হইতেছে ভাষা। জাপানে সমস্ত শিক্ষালয়, গবেষণা-প্রতিষ্ঠান, পরীক্ষাক্ষেত্র, কারখানা প্রভৃতিতে জাপানী ভাষাতেই শিক্ষা ও কার্য্যপরিচালনা করা হয়। জাপানী ভাষা শিক্ষা করা বিশেষ কঠিন ব্যাপার ও সময়সাপেক্ষ। কোন বিষয় শিক্ষার উপযোগী জাপানী ভাষা আয়ত্ত করা দুই তিন বৎসরেও সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। কারণ চীনা এবং জাপানী দুই ভাষাই প্রয়োজন। এই কারণেই আমাদের যুবকদের জাপানে শিক্ষার সুবিধা নাই। অতএব প্রশ্ন হইতে পারে জাপানের আদর্শ কিরূপে গ্রহণ করিব। জাপান নিজেই উন্নত দেশগুলির কার্য্যপ্রণালী ও যন্ত্রপাতি গ্রহণ করিয়াছে এবং এই সকল গ্রহণ করিয়া কি উপায়ে উন্নতি করিয়াছে ও করিতেছে এখন তাহাই আমাদের আদর্শ।

এই স্থলে শিল্পশিক্ষার জন্য বিদেশে আমাদের যুবকদের গমন বা প্রেরণ সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলিতে চাই। এই বিষয়ে রায় যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর মহাশয়ের চেষ্টা ও কার্য্য সম্বন্ধে বিশেষ পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। তাঁহার চেষ্টায় ও সাহায্যে বহু যুবক বিদেশ হইতে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া আসিলেও আমরা আশানুরূপ ফল পাইয়াছি কি? আশানুরূপ ফল না পাওয়ার এক প্রধান কারণ এই হইতেছে যে, শিল্পে যে শিক্ষানবিশীর প্রয়োজন

ইহাদের মধ্যে সেই শিক্ষানবিশীর একান্ত অভাব। "বাঙ্গালার-সমস্যা"য় শিল্পের আলোচনা করিবার সময় এই শিক্ষানবিশীর প্রকার ও প্রয়োজনীয়তা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। বিদেশে যাহাকে যে বিষয় শিক্ষা করিতে পাঠান হয় তাহার যদি সেই বিষয়ে অন্ততঃ কতক পূর্ব্ব জ্ঞান না থাকে এবং আমাদের দেশে সেই বিষয়ের অবস্থা কি তাহার জ্ঞান না থাকে তাহা হইলে শিক্ষার্থীর পক্ষে বিদেশ হইতে বিশেষ কিছু নূতন বা আমাদের উন্নতির জন্য যাহা প্রয়োজন তাহা আহরণ করা কঠিন এবং না পারিলে তাহাকে সম্যক দোষ দেওয়া যায় না। আমাদের দেশে যতদূর জ্ঞান লাভ করা সম্ভব তাহা করিয়া বিদেশে গেলে আমাদের কি আছে কি নাই বুঝিতে পারা যায়। তাহা না হইলে ভাসা-ভাসা জ্ঞান লইয়াই দেশে ফিরিতে হয়। সকলের না হোক অনেকের পক্ষেই যে ইহা ঘটিয়াছে তাহা কার্য্যক্ষেত্রেই বোঝা যায়। আবার অনেকের পক্ষে জ্ঞান থাকিলেও জ্ঞান প্রয়োগ করিবার ক্ষেত্র ও সুযোগ ঘটে নাই। জাপান কি করিয়াছিল অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই প্রথমে বিদেশী যন্ত্রপাতি আনিয়া এবং বিদেশী শিক্ষক আনিয়া শিল্প কারখানা ও শিক্ষালয় স্থাপন করে। দেশে শিক্ষা দিয়া তবে শিক্ষার উন্নতির জন্য যুবকদিগকে বিদেশে পাঠান হয়। আমাদের গবর্ণমেণ্ট এইরূপে শিল্পশিক্ষার বন্দোবস্ত করেন নাই এবং করিবেন বলিয়াও আশা করা যায় না। নূতন ব্যবস্থায় আমাদের দেশীয় মন্ত্রীদের হাতে ক্ষমতা থাকিলে কি হয় বলা যায় না। এখন আমাদিগকে নিজে নিজে চেষ্টা করিতে হইবে। শিল্প-শিক্ষা বা স্থাপনের জন্য যন্ত্রপাতি কিনিলে আজকাল নির্ম্মাতারা যন্ত্র বসাইয়া কাজ দেখাইয়া দিয়া যায়। তবে কিছুদিনের জন্য

বিদেশী বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করাই বাঞ্ছনীয়। এইরূপে হাতেকলমে শিল্পশিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া এবং এই সম্বন্ধে আমাদের দেশের অবস্থা কি তাহা বুঝাইয়া তারপর যদি এই বিষয়ে শিক্ষিত যুবকদিগকে জাপান বা অপর দেশে পাঠান হয় তাহারা তখন প্রয়োজনীয় জ্ঞান সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারে। আমার অভিজ্ঞতায় বলিতে পারি যে, রেশম-উৎপাদন শিল্প সম্বন্ধে আমার জাপানী ভাষায় জ্ঞান না থাকিলেও কার্য্যপ্রণালী শিক্ষার কোনরূপ বাধা হয় নাই। অল্প ইংরেজী বলিতে ও বুঝিতে পারে, এমন লোক প্রায় সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়, কিন্তু বিশেষজ্ঞদেরও ইংরেজী জ্ঞান কোন বিষয় বুঝাইবার জন্য যথেষ্ট নহে, অতএব দোভাষীর সাহায্য লইতে হয়। সেখানে ইংরেজী অভিজ্ঞ দোভাষী পাওয়াও কঠিন। এই শিল্প সম্বন্ধে আমার বিশেষ পূর্ব্বজ্ঞান না থাকিলে শিক্ষা অসম্ভব হইত। ইহার উপর আর এক কথা। জাপান ইউরোপীয়দিগের নিকট শিক্ষা করিয়া এবং তাহাদেরই যন্ত্রপাতি গ্রহণ করিয়া আজ তাহাদিগকে অনেক বাজার হইতে হটাইয়া দিতেছে। বিশেষ করিয়া ইহার দরুণই ইউরোপে অধিকাংশ কারখানায়, এমন কি টেক্‌নিক্যাল স্কুলেও, বিশেষ করিয়া এসিয়াবাসীদিগকে ঢুকিতে পর্য্যন্ত দেওয়া হয় না। আমি লণ্ডনস্থ ভারতবর্ষের হাই কমিশনার এবং ইংলণ্ডের পররাষ্ট্রসচিবের সুপারিশে ফ্রান্স এবং ইতালীর বৃটিশ রাজদূতের চিঠি পাইয়াও এবং লিয়নের বৃটিশ কন্‌সাল্ স্বয়ং আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেও লিয়নের রেশম পরীক্ষাগারের (Conditioning House) কার্য্য দেখিবার সুবিধা পাই নাই। মিলানেও তাহাই। আমাকে স্পষ্ট বলা হইল যে, কার্য্য কিছু বুঝাইয়া দেওয়া হইবে না, অনুগ্রহ এইটুকু করা

হইবে যে, আমাকে পরীক্ষাগারের ভিতর ঘুরাইয়া আনা হইবে। ভাগ্যক্রমে আমি জাপান ও আমেরিকায় আধুনিক সমস্ত যন্ত্রপাতির সহিত পরিচিত হইয়াছিলাম বলিয়া সেখানকার যন্ত্র দেখিয়াই কি কাজ হইতেছে বুঝিতে পারিলাম। প্রকৃতপক্ষে এই বিষয়ে ইহারা জাপান ও আমেরিকার পশ্চাতে পড়িয়া আছে। কিন্তু ইহাদের মনোভাব ইহা হইতে বেশ বুঝা যায়। জাপানেও আমাকে সুপারিশ লইয়া যাইতে হইত। কিন্তু কোথাও সুপারিশ পাইবার অসুবিধা হয় নাই এবং কোথাও ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিতে হয় নাই। আমেরিকায় আমার ভিসিটিং কার্ডের উপর ছাপানো পরিচয়ই অবাধে সমস্ত স্থানে প্রবেশের পক্ষে যথেষ্ট হইয়াছিল। জাপানেও, এমন কি, ছোট ছোট রেশম ও রেয়ন বয়নের গৃহ কারখানা দেখিতে গেলে, অনেক স্থলে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করা হইয়াছে যে, ভারতবর্ষ যদি এই সকল কাপড় বুনে তাহা হইলে তাহাদের কাপড় কোথায় কাটিবে? অপর পক্ষে সমস্ত দেশের যন্ত্র-নির্ম্মাতারা যন্ত্র বিক্রয়ের জন্য লালায়িত। এই সকল বুঝিয়া আমাদিগকে শিল্পশিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। কেবল বিদেশে আমাদের যুবকদের শিক্ষার জন্য পাঠাইলেই শিল্প গড়িয়া তুলিতে পারা যাইবে না।

পুস্তিকায় ব্যবহৃত চিত্রগুলির মধ্যে ২, ৩, ৬, ৭, ৯, ১৪ এবং ১৫নং চিত্র মিঃ জে, ডব্লিউ, রবার্টসন্ স্কট্ লিখিত 'ফাউণ্ডেশন্স অফ্ জাপান' নামক পুস্তক হইতে গ্রহণ করিয়াছি। অবশিষ্ট চিত্রগুলি জাপানে অবস্থানকালে আমারই সংগৃহীত। পরিশিষ্টে প্রদত্ত বিবরণের অধিকাংশ '১৯৩১ সনের ইয়ার্ বুক্ অফ্ জাপান' হইতে গৃহীত হইয়াছে।

মান্দালয় কৃষি কলেজ — শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ

৫ই মার্চ্চ, ১৯৩২

জাপানের উন্নতি হইল কিরূপে

আধুনিক জাপান

পৃথিবীর মানচিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে জাপান অতি ক্ষুদ্র দেশ। কয়েকটি দ্বীপ লইয়া প্রকৃত জাপান। এইগুলির আয়তন প্রায় ১,৪৭,০০০ বর্গমাইল। ইহার প্রায় সাত-ভাগের একভাগ মাত্র কর্ষণযোগ্য এবং অবশিষ্টাংশ পাহাড়ময়। কর্ষিত জমির অনেকাংশ পাহাড়ের গায়ে বা উপরে অবস্থিত। কর্ষিত জমির পরিমাণ বাংলা দেশের কর্ষিত স্থানের প্রায় তিন-ভাগের এক ভাগ।

১৮৯৪-৯৫ খৃষ্টাব্দে জাপান চীনকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া ফর্মোশা দ্বীপটি (জাপানী নাম তাইওয়ান্) আয়ত্তে পাইয়াছে। ১৯০৪-৫ খৃষ্টাব্দে রুষিয়াকে পরাজিত করিয়া সাখালিয়ন্ দ্বীপের দক্ষিণাংশ (জাপানী নাম কারাফুতো) প্রাপ্ত হয়। ১৯১৪-১৮ খৃষ্টাব্দে ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে যোগদান করিয়া প্রশান্ত মহাসাগরের কতকগুলি দ্বীপপুঞ্জ ম্যাণ্ডেট্ পাইয়াছে। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে সন্ধির নামে কোরিয়া (জাপানী নাম চোজেন্) জাপানের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে চীনের সহিত সন্ধিতে দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া (জাপানী নাম কান্টাং), বন্দোবস্ত পাইয়াছে। এমনই করিয়া জাপানের আয়তন বা রাজত্ব বাড়িয়াছে।

প্রকৃত জাপানের অধিবাসীর সংখ্যা এখন প্রায় সাড়ে ছয় কোটি। বিহার ও উড়িষ্যা বাহির হইয়া যাওয়ার পর এবং বাঙ্গালী অধ্যুষিত

সিলেট্, গোয়ালপাড়া, মানভূম ও সিংভূম বাদ দিয়া বর্ত্তমান বাঙ্গালা দেশের লোকসংখ্যা প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি এবং সমস্ত ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা প্রায় পঁয়ত্রিশ কোটি।

জাপানের মোজি বন্দরে প্রথমে আমি পৌছাই। যাহা নজরে পড়িল তাহাতে বোধ হইল এক ধনী দেশে আসিয়া পড়িয়াছি। বন্দরে ছোট-বড় জাহাজ অনেক রহিয়াছে এবং তাহাদের অধিকাংশের উপরেই প্রাতঃকালীন উদীয়মান সূর্য্যের আকৃতির চিত্রবিশিষ্ট জাপানী পতাকা উড়িতেছে। এখানে সমুদ্র সরু হইয়া প্রণালীতে পরিণত হইয়াছে। ইহার এক উপকূলে মোজি ও অপর দিকে সিমোনোসেকী শহর। উভয় উপকূলেই ব্যস্ততা, সকলেই কোন-না-কোন কাজে ব্যস্ত। জনতাপূর্ণ ফেরী জাহাজ যাওয়া-আসা করিতেছে, রেল চলিতেছে, কলকারখানার চিম্নীতে ধোঁয়া উঠিতেছে। রাস্তায় লোকজনের ভিড়, বাজারগুলি নানা জিনিষে পরিপূর্ণ এবং পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন। সকল লোকেরই পায়ে জুতা এবং পরিচ্ছদ রঙীন, নানাবর্ণে ও নানাবিধ চিত্রে চিত্রিত। এদেশে ভিখারী নাই এবং কেহ খালি পায়ে বা খালি গায়ে বাহির হয় না। খালি পায়ে খালি গায়ে বাহিরে হইবার মত এত দরিদ্র কেহই নয়।

এখনও এক শত বৎসর হয় নাই যখন জাপান বাহিরের অপর কোন দেশের সহিত সম্পর্ক রাখিত না। কোন বিদেশীকে ব্যবসা-বাণিজ্য বা কোনও উপলক্ষ্যে দেশে প্রবেশ করিতে দিত না। বিদেশী কোন জাহাজকে জাপানের কোন বন্দরে স্থান দিত না। বাণিজ্য বিস্তারের দরুণ উন্নতিশীল ইউরোপ ও আমেরিকার জাহাজগুলির জন্য জাপানে বন্দরের আবশ্যক হওয়ায় আমেরিকা ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে কমোডোর পেরীকে কয়েকটি যুদ্ধজাহাজ লইয়া জাপানে প্রেরণ করিল—

ভয় দেখাইয়া কোন বন্দর খুলাইতে পারে কি-না এই উদ্দেশ্যে। টোকিও বন্দরে পেরীর কামানের তোপে কেমন করিয়া জাপানের রুদ্ধ দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল ইহার প্রসঙ্গ কোন-না-কোন উপলক্ষ্যে খবরের কাগজে, মাসিক পত্রিকায় এবং সভাসমিতিতে এখনও প্রায়ই আলোচিত হয়। কারণ সকলেই বেশ বুঝিয়াছে যে, এই ঘটনা হইতেই জাপানের বর্ত্তমান উন্নতির কাল আরম্ভ। ইহাই বাহিরের সহিত সম্পর্ক ও আদান-প্রদানের দ্বার খুলিয়া দিল এবং জাপানের কূপমণ্ডুকত্ব দূর হইল। শোঁগুন তখনও দেশের কর্ত্তা, কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বের খ্যাতি-প্রতিপত্তি তখন আর নাই; বন্দর খোলা হইবে কি-না এই লইয়া দেশে মহাবাদবিতণ্ডা বাধিয়া গেল। প্রায় সকলেরই অমত। শোঁগুন কিন্তু শেষে রাজী হইলেন। ভয়েই রাজী হইলেন, দেশের লোকের এই ধারণা হইল এবং ইহাই শোঁগুনের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ। বিদেশীয়দের, বিশেষ করিয়া ইউরোপীয়দের, উপর লোকের তখন কি ধারণা তাহার নানা কৌতুককর ও হাস্যজনক ব্যাপার এখনও পত্রিকাদিতে আলোচিত হয়। আমেরিকান্‌রা যখন জাহাজ হইতে তীরে নামিত তখন শাসনকর্ত্তারা ঢেঁড়া পিটাইয়া লোকদিগকে সাবধান করিয়া দিত যেন সকলে ঘরের ভিতর থাকে। এক বাড়ীর সম্মুখে রক্ষিত বেঞ্চে রাত্রে কয়েকজন আমেরিকানকে বসিতে দেখিয়া শয়তানের ভয়ে বহুদিন পর্য্যন্ত এ বেঞ্চি কেহ স্পর্শ করে নাই। এখন ইহার সমস্তই উল্টা। আমি যখন জাপানে ছিলাম সেই বৎসর দুই লক্ষ মুদ্রা পৃথিবীর নানাদেশে জাপান সম্বন্ধে বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য বরাদ্দ হইল, যাহাতে বিদেশীয়েরা জাপানে আসে এবং জাপানের নানা স্থান ভ্রমণ করে। কারণ এইরূপ পর্য্যটকেরা আসিয়া জাপানে অর্থ ব্যয় করিলে নানা উপায়ে জাপানীদের লাভ হয়। এবং সঙ্গে সঙ্গে জাপানী জিনিষের সম্বন্ধে সংবাদ বাহির

হয়। এইরূপ পর্য্যটক আহ্বান আজকাল সকল দেশেই করা হয়। এই উপায়েই ফরাসী দেশের খুব আয় হয়, পর্য্যটক হইতে যে আয় হয় তাহা দ্বারাই প্যারিস শহর চলিতেছে বলিলেই হয়। জাপান প্রত্যেক দর্শনীয় স্থানে পর্য্যটকদিগের গমনাগমনের সুবিধা করিয়া দিয়াছে এবং থাকিবার জন্য ইংলণ্ড অপেক্ষাও বহুগুণে উৎকৃষ্ট হোটেল খুলিয়াছে। এই সকল হোটেলের অধ্যক্ষ, দাসদাসী সকলেই ইংরেজী বুঝে ও বলে। ভারতবর্ষেও এত উত্তম দর্শনীয় স্থান আছে যে, এইরূপ বন্দোবস্ত করিলে অনেকের বেশ দু'পয়সা আয়ের উপায় হয়।

পেরীর আগমনের পূর্ব্বে জাপানে কৃষি ও সকলের নিত্য প্রয়োজনীয় বস্ত্রবয়নই প্রধান শিল্প ছিল। বাহিরের সহিত আদান-প্রদান না থাকায় ব্যবসা-বাণিজ্যও অতি অল্প ছিল। কৃষক ও শিল্পীরা লোকের খাদ্য ও অপর প্রয়োজনীয় জিনিষ উৎপাদন করিত। সামুরাইগণ নিজেদের যোদ্ধব্যবসা করিত, উৎপাদন কিছু করিত না। অতএব দেশ দরিদ্রই ছিল। তখনকার দিনের ঘরবাড়ী, মন্দিরাদি, এমন কি, রাজপ্রাসাদও সেই দারিদ্র্যেরই পরিচায়ক। কিন্তু এখন যেখানেই যাও দেখিবে রাজপ্রাসাদতুল্য ইমারত উঠিয়াছে। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে টোকিয়ো ও ইয়োকোহামা শহর ভূমিকম্পে এবং এই কম্পনের সহিত প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে ধ্বংস হয়। কিন্তু ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে, অর্থাৎ প্রায় ছয় বৎসরের মধ্যেই ঐন্দ্রজালিকের মত দুই শহরই এমনভাবে পুনর্নির্ম্মিত হয় যে, ইউরোপ ও আমেরিকার যে-কোন সমৃদ্ধ শহরের সহিত ইহাদের তুলনা করা চলে। টোকিও শহর কলিকাতার দ্বিগুণ। পৃথিবীর এমন কোন দেশ নাই যেখানে জাপানের তৈয়ারি জিনিষ বিক্রয় হয় না এবং জাপানীদের নিজের তৈয়ারি ও জাপানী নাবিক দ্বারা চালিত

জাহাজ যায় না। জাপানী জাহাজেই জাপানী জিনিষ চালান দেওয়া হয় এবং অপর দেশ হইতে প্রয়োজনীয় জিনিষ আনা হয়। পৃথিবীর সকল স্থানেই জাপানী যাত্রী-জাহাজ ইউরোপ ও আমেরিকার যাত্রী-জাহাজগুলির সহিত সমকক্ষতা করে। এমন কোন জিনিষ নাই যথা—কাপড়-চোপড়, বাসন-পত্র, কাচের জিনিষ, ছুরীকাঁচি, খেলনা পুতুল, কলকব্জা, ঘড়ি, জুতা, তাঁত ইত্যাদি যাহা জাপানে প্রস্তুত না হয় এবং যাহা জাপান অন্য দেশে প্রস্তুত এই সকল জিনিষ অপেক্ষা সস্তায় বিক্রয় না করে। এই সেদিনকার কথা, কুড়ি-পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বেও বোম্বাইয়ের কলে তৈয়ারি কাপড় জাপানে বিক্রয় হইত। এখন ওসাকা শহর প্রধানতঃ বস্ত্রবয়নের জন্যই কলিকাতার দ্বিগুণ বড় শহরে পরিণত হইয়াছে। আর জাপানের তৈয়ারি সুতার কাপড় মাঁঞ্চেষ্টারের তৈয়ারি কাপড় অপেক্ষা সস্তা দরে বিক্রয় হইতেছে। জাপানে কিন্তু তুলা জন্মে না। প্রধানতঃ ভারতবর্ষ হইতেই তুলা ক্রয় করিয়া লইয়া গিয়া কাপড় বোনা হয়। সুতার কাপড়, রেশমসুতা ও রেশমী কাপড়, রেয়ন বা মেকি রেশম কাপড় এখন অপর সকল দেশ অপেক্ষা জাপানই চীন, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকায় বেশী বিক্রয় করিতেছে এবং ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মানী, ইতালী প্রভৃতি দেশকে এই ব্যবসায়ে পরাস্ত করিয়াছে। পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় চীনা-মাটির বাসন প্রস্তুতের কারখানা জাপানের নাগোয়া শহরে। জাপানের রেলসমূহের আমেরিকার ন্যায় ধনীদেশের রেলের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। জাপানী রেল-ইঞ্জিনিয়ারগণ রুষিয়ার সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট এবং পারস্য কর্ত্তৃক আহুত হইয়া রুষিয়ায় ও পারস্যে রেল নির্ম্মাণ করিতেছে। অল্পদিন

হইল শ্যাম দেশে জাপানী ইঞ্জিনিয়ারগণ এইরূপ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে এবং আফগানিস্থানেও হইবে বলিয়া শোনা যায়। শিল্প-বাণিজ্যে অসাধারণ উন্নতি করিলেও কৃষিও উপেক্ষিত হয় নাই। জাপান পাহাড়ময় দেশ এবং কর্ষণোপযোগী জমি অল্প। প্রত্যেক কৃষকের গড়পড়তা প্রায় তিন-চার বিঘা হইতে আট-দশ বিঘার বেশী জমি নাই এবং অনেকেরই বলদ নাই। কোথাও কোথাও ঘোড়া আছে। অধিকাংশ স্থলেই কৃষক-পরিবার কোদাল ইত্যাদির সাহায্যে নিজেরাই কর্ষণ ইত্যাদি করে। উন্নত বীজ ও উন্নত প্রণালী দ্বারা এই সামান্য জমি হইতেই যথেষ্ট শস্য উৎপন্ন হয়। রেশমকীট পালন কৃষকের উপশিল্প এবং এই উপশিল্প দ্বারা প্রত্যেক এক শতের মধ্যে চল্লিশ জন কৃষকের আয় দ্বিগুণ হয়। আর রেশমসূতা ও রেশমী বস্ত্রের বিদেশে বিক্রয়ের মূল্য হইতেছে জাপানের সমগ্র উৎপন্নের মূল্যের প্রায় অর্দ্ধেক। জাপানী রেশমসূতা এবং রেশমী বস্ত্র প্রায় সমস্ত পৃথিবী ছাইয়া ফেলিয়াছে। যখন রুষিয়ার ভয়ে ইংরেজ প্রভৃতি সকলেই কম্পিত তখন সেই রুষিয়া ও চীনকে জাপান যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছে। এখন পৃথিবীর যে-কোন জাতিকে যুদ্ধে পরাজিত করিতে পারে, প্রত্যেক জাপানীর এই ধারণা ও বিশ্বাস। জাপানী যুদ্ধ-জাহাজের সংখ্যা এখন ইংরেজ ও আমেরিকার যুদ্ধ-জাহাজের সহিত তুলনীয়। এই সকল যুদ্ধ-জাহাজ, ডুবো জাহাজ, এরোপ্লেন ইত্যাদি সমস্তই জাপানে তৈয়ারি হইতেছে। যাহাতে আরও যুদ্ধ-জাহাজ নির্ম্মাণ করিয়া জাপান ইংলণ্ডের উপরে না যায় এই জন্য ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী আমেরিকা, জাপান, ফ্রান্স ও ইতালীকে লইয়া মন্ত্রণা করার পর জাহাজের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করিয়া এক সন্ধি করিয়াছেন। এই সন্ধি জাপানীদের মনঃপূত হয় নাই বলিয়া যে সকল জাপানী

মন্ত্রী এই সন্ধিতে মত দিয়াছেন তাঁহাদের উপর গুলি চলিয়াছে এবং তাঁহাদের ঘরবাড়ী ও দেহ পালোয়ান দ্বারা এখন রক্ষিত হইতেছে। গুলির আঘাতের ফলেই প্রধান মন্ত্রী হামাগুচী অল্পদিন হইল প্রাণ হারাইয়াছেন। জাপানের এই কৃতিত্ব ও সাফল্য কোথা হইতে আসিল?

প্রায় ত্রিশ বৎসরের মধ্যেই আধুনিক জাপান-রূপ সুদৃঢ় ইমারত কিরূপে গঠিত হইল, কোন্ সুদৃঢ় ভিত্তি থাকাতে ইহা এত শীঘ্র গঠন করা সম্ভব হইল, ইহা বুঝাইবার জন্য জাপানের এবং জাপানীদের কিছু পরিচয় দিয়া পরে কোন্ উপায়ে ইহা সম্ভব হইল তাহার মোটামুটি বিবরণ দেওয়া হইবে। অধিবাসী লইয়াই দেশ। অধিবাসীদের দোষ-গুণেই দেশের অবনতি বা উন্নতি। কি গুণে জাপানীরা উন্নতি করিতে সমর্থ হইল তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করা যাইবে। আর আধুনিক জাপানের অবস্থা কি তাহা বুঝাইবার জন্য পরিশিষ্টে বিশেষ বিশেষ শ্রমশিল্প ইত্যাদির মোটামুটি বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

খৃষ্টপূর্ব্ব ৬৬০ শতাব্দে জাপানের প্রথম সম্রাট জিম্মুতেন্নো সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার পূর্ব্বে পৌরাণিক যুগ। গ্রীসীয় ও ভারতীয় পৌরাণিক যুগের মত জাপানেরও পৌরাণিক যুগের ইতিহাস দেবতা ও অসুরগণের বিবরণে পূর্ণ। এই সকল দেবতার মধ্যে প্রধান হইতেছে "আমাতেরাসু ওমিকামী" বা সূর্য্যদেবী যিনি জাপানের রাজবংশের জন্মদাত্রী বলিয়া এখনও পূজিতা হন।

একবার সূর্য্যদেবী তাঁহার ভ্রাতা সুশানোর উপর রাগ করিয়া

এক গুহার মধ্যে লুকাইত হন। ফলে সমস্ত জগৎ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়। দেবতাগণ বহু সাধ্যসাধনা করিয়া এবং নৃত্যগীতাদির নানারূপ আয়োজন করিয়াও তাঁহাকে বাহিরে আসিতে সম্মত করিতে পারিল না। তখন কোন দেবতা একটি তাম্রফলকের দর্পণ গুহার সম্মুখে এক বৃক্ষে ঝুলাইয়া ইহার নিম্নে আগুন জ্বালাইয়া দিল। এই দর্পণে নিজের প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া সূর্য্যদেবী গুহা হইতে বাহিরে আসিলেন, সঙ্গে সঙ্গেই সর্ব্বাপেক্ষা বলবান দেবতা একখানা বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড গড়াইয়া আনিয়া গুহার মুখ বন্ধ করিয়া দিল। সূর্য্যদেবীকে এই দর্পণ প্রদত্ত হইল। তাঁহার প্রপৌত্র যখন পৃথিবীতে নামিয়া আসিয়া জাপানের সম্রাট হইলেন তখন সূর্য্যদেবী তাঁহাকে এই দর্পণ দান করিয়া বলিলেন, "এই দর্পণে আমার আত্মা বর্ত্তমান জানিবে এবং ইহার পূজা করিলে আমারই পূজা করা হইবে। যে-রাজবংশ তুমি স্থাপনা করিলে তাহা স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের আয়ুকালব্যাপী হইবে।" এই দর্পণ জাপানের রাজদণ্ডের নিদর্শনরূপে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। দ্বিতীয় নিদর্শন হইতেছে একখানা তরবারি যাহা সূর্য্যদেবীর ভ্রাতা সুশানো বহুশির-বিশিষ্ট এক রাক্ষস বা ড্র্যাগনকে নিহত করিয়া তাহার লেজ্ হইতে প্রাপ্ত হন। তৃতীয় নিদর্শন একটি হার। ইহাও দেবতাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত। দর্পণ, তরবারি ও হার প্রথম প্রথম সম্রাটেরা সঙ্গে সঙ্গেই রাখিতেন। দশম সম্রাট সুইজিন্ তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যাকে তত্ত্বাবধারিণী নিযুক্ত করিয়া নিদর্শনগুলি কাসামু নামক গ্রামে স্থাপন করেন এবং এই সকলের নকল প্রস্তুত করিয়া নকলগুলি কাছে রাখেন। একাদশ সম্রাট সুইনিনের সময় হইতে তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যার নির্দ্দেশানুসারে ঈসে নামক স্থানে মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া এই মন্দিরে নিদর্শনগুলি গত ১৯৩৫ বৎসর যাবৎ রক্ষিত হইয়া আসিতেছে।



ঈসের মন্দির



সমৃদ্ধ কৃষকের গৃহ

এই মন্দির কাঠ দিয়া নির্ম্মিত এবং ঘাস দিয়া ছাওয়া চালাঘরের মত। প্রথম প্রথম জীর্ণ হইলে মন্দির পুনর্নির্ম্মিত হইত। নূতন মন্দির পুরাতন মন্দিরের অবিকল নকল হওয়াই নিয়ম। সমান মাপ, সমান সংখ্যক ও সমান মাপের কাঠ, কাঁটা, পেরেক, চাল ইত্যাদি দিয়া নূতন মন্দির পুরাতন মন্দিরের অবিকল নকল করিয়া গঠিত হয়। মন্দিরের দেওয়াল, বেড়া এবং সীমানার বেড়াও কাঠ দিয়া এইরূপে নির্ম্মিত। এখন জীর্ণ হওয়ার অপেক্ষা না করিয়া প্রতি বিশ বৎসর অন্তর নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া পুরাতন মন্দির ধ্বংস করা হয়। নিদর্শনগুলি নূতন মন্দিরে স্থানান্তরিত করার সময় দেশব্যাপী উৎসব হয়। মন্দির নির্ম্মাণ এবং উৎসবের সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য গবর্ণমেণ্ট প্রায় বিশ লক্ষ টাকা প্রদান করেন। সম্রাট বা সম্রাটের নিকট-সম্পর্কীয় কোন প্রতিনিধি, মন্ত্রিবর্গ, যুদ্ধবিভাগের বড় বড় কর্ম্মচারী সকলে উপস্থিত থাকিয়া উৎসব-ক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। নিকটবর্ত্তী সমুদ্রে বহু যুদ্ধ-জাহাজ উপস্থিত থাকে। এই ঘটা হইতে সহজেই বুঝা যায় সূর্য্যদেবী জাপানে কিরূপ পূজা প্রাপ্ত হন। সকল জাপানী জীবনের কোন-না-কোন সময়ে একবার ঈসে তীর্থে আসিয়া পূজা দিয়া যায়। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে একবার এই উৎসব হয়। উৎসবের কয়েকদিন পরেই আমি ঈসে দর্শন করি। বহু লোক তখন তীর্থে আসিতেছিল। তীর্থে পূজা ইত্যাদির আড়ম্বর নাই, অতএব পুরোহিত-পাণ্ডারও দৌরাত্ম্য নাই। মন্দিরের ভিতরে প্রবেশের বা নিদর্শনগুলি দর্শনের কাহারও অধিকার নাই। ভিতরের বেড়ার ফটকে একখানা কাপড় বিছান আছে। লোকে ইহার সম্মুখে উবু হইয়া বসিয়া মাথা কিছু নামাইয়া, ধীরে হাতে তালি দিয়া এক-আধ মিনিটের জন্য

নিজের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছে এবং কাপড়ের উপর পয়সা টাকা যাহার যাহা খুশী ছুঁড়িয়া দিতেছে। ইহাই হইল পূজা এবং ইহার জন্যই লোকে দূরদেশ হইতে আমারই সঙ্গে আসিল এবং আমারই সঙ্গে ট্রেনে ফিরিল। ফিরিবার সময় পুরোহিতদের নিকট হইতে কবচ কিনিয়া লইয়া যাওয়া হয় এবং এই কবচ গৃহে রক্ষিত হয়।

খৃষ্টপূর্ব্ব সাত শতাব্দ হইতে যীশুখৃষ্টের জন্মের পর পাঁচ শতাব্দ পর্য্যন্ত বারশত বৎসর সময়কে Legendary বা কিংবদন্তীমূলক যুগ বলা হয়। কারণ এই সময়ের কোনো লিখিত ইতিহাস পাওয়া যায় না। পঞ্চম শতাব্দে বৌদ্ধধর্ম্ম গৃহীত হয় এবং কোরিয়া ও চীনের সংশ্রবে আসাতে শিক্ষা ও শিল্পকলা বর্দ্ধিত হয়। এই সময় হইতে লিখিত ইতিহাস পাওয়া যায়। জাপানের লিখিত ভাষা চীন হইতে গৃহীত এবং রেশমপালন-শিক্ষা কোরিয়া হইতে প্রাপ্ত। দ্বাদশ শতাব্দের শেষ ভাগে 'শোঁগুন' অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রী বা সামন্ত দেশের প্রকৃত শাসনভার হস্তগত করেন এবং সম্রাট রাজকার্য্যের সহিত কোন সম্পর্ক না রাখিয়া দেবতার মত থাকিতে ও পূজিত হইতে লাগিলেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় আট শত বৎসর শোঁগুনত্ব বর্ত্তমান ছিল এবং ইহা লইয়া দেশে যুদ্ধবিগ্রহ চলিত, যখন যে সামন্ত বলবান হইয়াছে সে-ই শোঁগুনত্ব দখল করিতে চেষ্টা করিয়াছে। প্রায় এক শত বৎসর নামমাত্র সম্রাটের ন্যায় নাম-মাত্র 'শোঁগুন' খাড়া করিয়া কোন কোন সামন্ত শোঁগুনের প্রতিনিধি-রূপে দেশ শাসন করিয়াছে। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর কিয়োতোতে এক সম্রাট এবং কামাকুরাতে রাজবংশেরই এক জন অপর এক সম্রাটরূপে বর্ত্তমান ছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে সামন্তগণ অতি প্রবল হইয়া উঠে এবং নামে মাত্র শোঁগুনত্ব বর্ত্তমান থাকে। ষোড়শ শতাব্দের প্রথমে

টোকুগাওয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা দেশের সমস্ত সামন্তগণকে বশে আনিয়া শোগুনের প্রাধান্য স্থাপন করেন এবং ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই বংশ শোগুন-রূপে দেশের প্রকৃত শাসনকর্ত্তা থাকেন। এই বৎসর সম্রাট শোগুনের হাত হইতে রাজ্য শাসনের ভার নিজে গ্রহণ করেন। ইহাই হইল জাপানের ইতিহাসে restoration বা সম্রাট কর্ত্তৃক রাজ্যভার পুনর্গ্রহণ। দেশের সমস্ত সামন্ত রাজি হইয়া তাঁহাদের সমস্ত অধিকার সম্রাট মেজীর হস্তে অপর্ণ করেন। ইহা জাপানের জীবনে এক প্রসিদ্ধ ঘটনা। ইংলণ্ডের অনুকরণে এই সকল সামন্তকে কাউন্ট, ভাইকাউন্ট প্রভৃতি উপাধি দেওয়া হয়। সামন্তগণ সামুরাই নামে এক যোদ্ধৃশ্রেণী গড়িয়া তুলিয়া ছিলেন। সামুরাইদিগের ভরণপোষণের জন্য জায়গীর প্রভৃতি দেওয়া হইত। ইহারা যুদ্ধ ব্যবসায় ছাড়া আর কিছুই করিত না, এবং সাধারণ লোকের সহিত ব্যবহারে অত্যন্ত উদ্ধত ছিল। দেশের ব্যবসায়ী কৃষী-শিল্পীদিগকে তাহারা ঘৃণা করিত। বৈবাহিক আদান-প্রদান ত ছিলই না, এমন কি, সাধারণ লোককে সামুরাইগণ অনেক সময় কাছে পর্য্যন্ত আসিতে দিত না। সম্রাট মেজীর রাজ্যভার গ্রহণের অল্প পরেই ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে এই জাতিভেদ ঘুচাইয়া দেশের সকল লোককে সমান বলিয়া ঘোষণা করা হইল। আর সামুরাইদের জায়গীর ইত্যাদি সমস্ত সরকারে বাজেয়াপ্ত করিয়া কতক নগদ মূল্য এবং কতক কোম্পানীর কাগজের মত বণ্ড দেওয়া হইল। ফলে, সামুরাইদের দুরবস্থার আর সীমা রহিল না, কারণ তাহারা ব্যবসা ইত্যাদি কিছুই জানিত না। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের নানাবিধ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ফলে সামুরাইগণ অল্পদিনেই দেশের বড় বড় ব্যবসাদার এবং শিল্পের কর্ণধার হইয়া উঠিল। কাউন্ট, ওকুমা, প্রিন্স ইতো প্রভৃতির নাম

অনেকেই জানেন। এই সকল পূর্ব্ব-সামন্তগণ সম্রাট মেজীর দক্ষিণ-হস্তস্বরূপ হইয়া মাত্র ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসরের মধ্যেই দেশকে পৃথিবীর অগ্রসর ও উন্নত দেশগুলির সমকক্ষ করিয়া তুলিল।

জাপানের বর্ত্তমান সম্রাট হিরোহিতো প্রথম সম্রাট হইতে একশ-চব্বিশতম। ইনি ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ২৫-এ ডিসেম্বর সম্রাট তাইসোর মৃত্যুর পর সিংহাসনারোহণ করেন। প্রত্যেক সম্রাটের রাজত্বকালের বা অব্দের পৃথক নাম দেওয়া হয়। মেজী অব্দ ১৮৬৮ হইতে ১৯১২ পর্য্যন্ত, তাইসো অব্দ ১৯১২ হইতে ১৯২৬। এখন সোওয়া অব্দ ১৯২৬ হইতে চলিতেছে। এই কারণে জাপানী ইতিহাসে সময়-নির্দ্দেশ এক কঠিন ব্যাপার।

প্রথম হইতেই ভিন্ন দেশের সহিত জাপানের আদান-প্রদান বেশী ছিল না। বহু পূর্ব্বে চীন হইতে লিখন-পদ্ধতি ও সভ্যতা গ্রহণ করা হয় এবং ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত নানাবিধ শিল্পকলা আসে। ১২৭৪ ও ১২৮১ খৃষ্টাব্দে কোবলা খাঁ দুইবার জাপান আক্রমণ করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু দুই বারেই ঝড়ের দরুণ সমুদ্র পার হইতে অপারগ হন। দেবতাদের প্রেরিত ঝড়ে জাপান রক্ষিত হয় লোকের মনে এই বিশ্বাস। ১৫৪১ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজেরা, পরে স্পেনবাসী ও হল্যাণ্ড-বাসীরা ব্যবসায়ের জন্য জাপানে আসে। ১৫৪৯ খৃষ্টাব্দে সেণ্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার খৃষ্টধর্ম্ম আমদানি করেন। জেসুইট্ সম্প্রদায় দ্বারা শীঘ্রই রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টধর্ম্ম বেশ প্রসারলাভ করে। কিন্তু পর্ত্তুগীজ, স্প্যানিয়ার্ড ও ডাচ ব্যবসায়ীদের এবং জেসুইট ও ফ্রান্সিস্কান পাদ্রীদের রেষারেষি এবং জেসুইটদিগের রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের দরুণ দেশের স্বাধীনতার হানি হইতে পারে এই ভয়ে ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে সমস্ত বিদেশী পাদ্রি জাপান হইতে

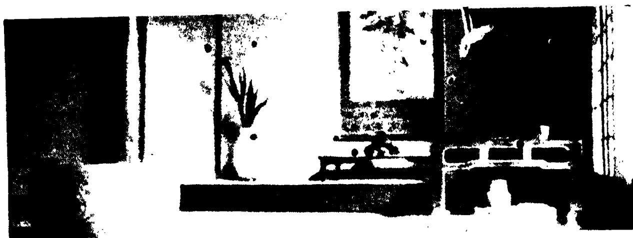
বিতাড়িত হয় এবং যাহারা খৃষ্টধর্ম্মানুসারে পূজা করিবে তাহাদের মৃত্যু-দণ্ড হইবে এই আদেশ প্রচারিত হয়। ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে এক বিদ্রোহের দরুণ বিদেশী ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে দমিত হয়। এই ব্যাপার লইয়া অনেক লোক হত এবং বিদেশীদের সহিত আদান-প্রদান বন্ধ হয়। শুনা যায়, অনেকে গোপনে খৃষ্টধর্ম্ম পালন করিত। সম্রাট মেজী কর্ত্তৃক রাজ্য-ভার পুনর্গ্রহণের পূর্ব্বে, অর্থাৎ ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, এই ধর্ম্মের পুনরুত্থান হইতে পারে নাই। এই দীর্ঘ সময়ের পর কমোডোর পেরী কিরূপে বিদেশীয়দের সহিত আদান-প্রদান পুনঃস্থাপন করেন তাহার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

উন্নতির ভিত্তি

জাপানীদের চরিত্রে যে-সকল গুণ থাকার জন্য তাহারা এত শীঘ্র উন্নতি করিতে সমর্থ হইয়াছে সেইগুলিকে উন্নতির ভিত্তি বলিতেছি। কোন একটা গুণ কোন বিশেষ মানুষের বা জাতির একচেটিয়া নহে। শিক্ষা ও অভ্যাস দ্বারা সকল মানুষই সকল গুণ অর্জ্জন ও আয়ত্ত করিতে পারে। জাপানীদের গুণাবলির আলোচনা করিবার সময় ভারতীয়দের মধ্যে সেইগুলির বর্ত্তমানতা বা অভাবের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে।

জীবনের অনাড়ম্বরতা।—জাপানীদের ঘরদ্বারে আসবাবপত্র ও কাপড়-চোপড়ের বৃথা আড়ম্বর নাই। ঘর সাদাসিধা ধরণের। কামরা-গুলি যতদূর সম্ভব ছোট। দেওয়ালের যেখানে না দিলে নয় মাত্র সেটুকু কাঠের ফ্রেমে তৈরি করিয়া বাকীটা কাগজ মুড়িয়া কাজ চালান হয়। কাগজ বৎসরে একবার বদলাইয়া দেওয়া হয়।

কামরার বাহিরেই ছোট কাঠের বারান্দা। রাত্রে বারান্দার কিনারায় টিনের পর্দ্দা বা আমাদো লাগাইয়া দেওয়া হয় এবং দিনে খুলিয়া রাখা হয়। ঘরের মেঝে খড়ের তৈয়ারি। ছয় ফুট লম্বা তিন ফুট চওড়া ও তিন ইঞ্চি পুরু খড়ের গদি তৈয়ারি করিয়া ইহার উপর মাদুর বিছাইয়া কিনারাগুলি চওড়া ফিতা দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হয়। ইহার নাম তাতামি। কামরার মাপ ছয়, আট কিম্বা দশ তাতামি। তাতামিগুলি বসাইয়া কামরার মেঝে তৈয়ারি হয়। মেঝে জমি হইতে প্রায় দুই ফুট উঁচু। বৎসরে একবার উঠাইয়া ঝাড়িয়া রৌদ্রে দিয়া তাতামিগুলি পরিষ্কার করিবার নিয়ম। কামরার একদিকে কিছু উচ্চ একটি বেদি বা 'তোকোনোমা' থাকে। এই তোকোনোমার উপর একটি কি দুইটি ছোট গালার কাজ করা চৌকি থাকে। বাঁশের বা কাঠের ফুলদানিতে ফুলের দুই-তিনটি ডাল বা ঘাস সাজান। চৌকির উপর ট্রে-তে লিখিবার কালি, তুলি ও কাগজ রাখা হয়। তোকোনোমার উপর দেওয়ালে একটি পট বা 'কাকেমোনো' ঝোলান। পটে কোন প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি বা চীনা অক্ষরে কোন নীতিপূর্ণ উপদেশ অঙ্কিত থাকে। ঘর গরম করিবার জন্য একটি 'হিবাচি' বা অগ্নিপাত্র থাকে। এই হইল ঘরের আস্‌বাব। মেঝের উপর ছোট চৌকোণা আসনের মত গদির উপর পা মুড়িয়া বসিতে হয়। একই ঘরে শোয়া, খাওয়া ও বসার কাজ চলে। খাইবার সময় একটি ছোট চৌকির উপর খাদ্য দেওয়া হয়। শুইবার সময় গদি বিছাইয়া দেওয়া হয় এবং দরকার হইলে ঘরজোড়া বড় একটি মশারি টাঙ্গান হয়। দিনের বেলা বিছানা গুটাইয়া হয়ত কামরারই এক কোণে দেওয়ালের খোপরে রাখিয়া দেওয়া হয়। ছোটগৃহে হয়ত মাত্র এইরূপ দুইটি কামরা। বড়গৃহে আরও বেশি কামরা থাকে



তোকোনোমা পৃঃ ১৪



গ্রাম্য হোটেলে দাসী চা লইয়া আসিতেছে
স্ত্রীলোকদের এই পোষাকই সাধারণ পৃঃ ১৫

এবং কোন কোন গৃহ দ্বিতল করা হয়। গৃহে ঢুকিবার পথ ছোট একটি কামরার মত তৈয়ারি। এইখানে জুতা ছাতা ইত্যাদি রাখিবার স্থান আছে। বেঞ্চিতে বসিয়া জুতা খুলিয়া চটি পায়ে দিয়া ঘরে ঢুকিতে হয়। থাকিবার বাড়ী, আপিস্, দোকান, কারখানা, লেবরেটরী, স্কুল প্রভৃতি সর্ব্বত্রই বাহিরে জুতা খুলিয়া রাখিবার প্রথা। যে-চটি পায়ে ঘরে চলাফেরা করা হয় তাহা লইয়া প্রস্রাবখানা বা পায়খানায় ঢুকিবার নিয়ম নাই। প্রস্রাবখানা বা পায়খানা হয়ত বারান্দারই পাশে। কিন্তু পায়ের চটি বাহিরে রাখিয়া প্রস্রাবখানা ও পায়খানার দরজার সম্মুখে রক্ষিত চটি পায়ে দিয়া ঢুকিতে হয়। ঘরের মেঝে বারান্দা সমস্তই খুব পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন। কোথাও ধূলিমাত্র থাকিবার জো নাই।

ঘরে চেয়ার টেবিল বাক্স পেট্রা আলমারীর কোন বালাই নাই। পরিধেয় বস্ত্রও দেওয়ালের খোপরের ভিতর রক্ষিত হয়। ঘরের দরজা জানালার মত এই খোপরের দরজাও টানিয়া লাগাইয়া বা খুলিয়া দেওয়া যায়। কোথাও কব্জা ও তালাচাবির কোন বন্দোবস্ত নাই।

পরিধেয় বস্ত্র :—স্ত্রীপুরুষ সকলেরই দেহের উপর কিমোনো। পুরুষেরা জাঙ্গিয়া এবং স্ত্রীলোকেরা পাতলা লুঙ্গি ব্যবহার করে। এই পোষাকেই গেটা বা খড়ম পায়ে দিয়া বাহিরে যাওয়া যায়। পুরুষেরা এখন আপিসের বা বাহিরের পোষাক হ্যাট কোট প্যাণ্ট গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু সাধারণ জাপানী পোষাকে গেলেও কোন দোষ নাই। স্ত্রীলোকেরা বিলাতি পোষাক গ্রহণ করে নাই। কৃষকশ্রেণী এবং কুলীমজুরেরা আঁটা পায়জামা ব্যবহার করে এবং কৃষক-রমণীও মাঠে কাজ করিবার সময় এইরূপ পায়জামা পরে। শীতের

জন্য স্ত্রী-পুরুষ সকলেই পায়ে মোটা কাপড়ের বা রবার-দেওয়া কাপড়ের মোজা ব্যবহার করে। পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও অপর আঙ্গুলগুলির মধ্যে ফাঁক থাকাতে এই মোজার উপর গেটা পরিতে পারা যায়।

স্ত্রীলোকেরা কোন রূপ গহনা ব্যবহার করে না। ধনী স্ত্রীলোকেরা দামী কিমোনো ব্যবহার করে এবং ইহাদের ধনের পরিচয় কোমরে জড়ান ওবিতে। কোন কোন ওবির দাম না-কি দুই-তিন হাজার টাকা।

সর্ব্বত্রই পায়খানা ও প্রস্রাবখানার ব্যবহার। এই সকল বেশ পরিষ্কার, আধুনিক চিনা মাটির তৈয়ারি। বিষ্ঠা নীচে গহ্বরে পড়ে এবং জমিতে সাররূপে ব্যবহৃত হয় বলিয়া কৃষকশ্রেণী গৃহস্থকে কিছু দক্ষিণা দিয়া ইহা উঠাইয়া লইয়া যায়। গ্রামে রোজ পায়খানা পরিষ্কার হয় না, হয়ত মাসে কি পনর দিনে একবার।

এখন প্রায় সর্ব্বত্রই বৈদ্যুতিক আলোকের ব্যবহার, এমন কি, গ্রামে কৃষকের গৃহেও।

জাপানীরা রোজই স্নান করে। অতি গরম জলে স্নান করে বলিয়া স্নানের জন্য খরচ আছে। সাধারণ গৃহস্থের বাড়ীতে স্নানের বন্দোবস্ত নাই। সাধারণ স্নানাগারে গিয়া স্নান করিতে হয়। স্নানাগারে বড় বড় চৌবাচ্চায় জল থাকে। ইহাতে নামিয়া আভাঙ করিয়া স্নান করা হয়। কাপড় পরিয়া ইহাতে নামিবার নিয়ম নাই। উপরে সাবান দিয়া ঘা ঘসিয়া ধুইয়া উলঙ্গাবস্থায় চৌবাচ্চায় নামিতে হয়। পনর-কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে স্ত্রীপুরুষ সকলেই একই স্নানাগারে এক সঙ্গে স্নান করিত। এখন স্ত্রীলোক ও পুরুষের স্নানাগার পৃথক।



কৃষকরমণী মাঠে কোদাল পাড়িতেছে পৃঃ ১৫

খাদ্য ও সাদাসিধা ধরণের। আমাদের মত নানাবিধ তরকারী, পায়স ও মিষ্টান্নের চলন নাই। কেননমেত ভাতই প্রধান খাদ্য। কৃষক-শ্রেণী চাকল ও যব বা গম একসঙ্গে সিদ্ধ করিয়া খায়। সকলেই সয়বিন-নামক শিমের বীজ হইতে তৈয়ারি এক প্রকার নরম পিঠার মত জিনিষ স্যুপের সঙ্গে বা সামান্য ভাজিয়া ব্যবহার করে, ইহা অতি পুষ্টিকর। বিজ্ঞানবিদেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, সয়বিনের বীজে মাংসের দ্বিগুণ পুষ্টিকর খাদ্য বর্ত্তমান। ইহা ছাড়া মূলা সিদ্ধ, মাছ ও বেঙের ছাতা (mushroom) হইল সাধারণ তরকারী। কোন কোন মাছ কাঁচাই খাওয়া হয় কিম্বা সামান্য মাত্র ভাজিয়া লওয়া হয়। সামুদ্রিক শামুক, গুগ্‌লি এবং শ্যাওলার খুব চলন।

কাঁচা চায়ের পাতা (গ্রীন্ টী) জলে সিদ্ধ করিয়া গরম গরম জল হইল ইহাদের পানীয়। ইহার নাম ওচা। ঠাণ্ডা জল কেহ পান করে না। ওচার সহিত দুগ্ধ চিনি ইত্যাদি কিছুই ব্যবহৃত হয় না। ছোট ছোট চীনামাটির বাটিতে ওচা বিতরিত হয়। ওচা দান হইল আগন্তুককে আহ্বানের প্রধান অঙ্গ। বাড়ীতে, আপিসে, কারখানায় যেখানে যাও প্রথমেই ওচা দিয়া আহ্বান করা হয়। জাপানী প্রথানুসারে আহ্বানকারী বা বাড়ীর কর্ত্তাও অতিথিদের সহিত ওচা পান করেন। বিশেষ ক্ষেত্রে জলখাবারের বন্দোবস্ত হইলেও ইহাই নিয়ম।

সকলেই চাল হইতে প্রস্তুত শাকে নামক মদ ব্যবহার করে। শাকে পান দূষণীয় বলিয়া বিবেচিত হয় না।

এই হইল আধুনিক জাপানের অবস্থা। মিতব্যয়িতা জাতীয় গুণ বলিয়া বিবেচিত হয় এবং নীতিশিক্ষার সহিত শিক্ষা দেওয়া হয়। এখন পরিধেয় বস্ত্রের বাড়াবাড়ি হইয়াছে। মধ্যে শোগুনের সময়

মিতব্যয়িতার জন্য নিয়ম ছিল যে, সাধারণ লোক রেশমী বস্ত্র ব্যবহার করিতে পারিবে না। এখন ব্যবসা ইত্যাদির দ্বারা যাহারা ধনী হইয়াছে বা হইতেছে তাহাদেরও বাড়ীঘর যে বিশেষ জাঁকজমকশালী তাহা নয়। তবে আপিস-আদালত, কারখানা, বড় বড় দোকান ইত্যাদি সমস্তই এবং ইহাদের মধ্যে আসবাবপত্রও পাশ্চাত্য ধরণের। টেবিল চেয়ার ইত্যাদির দস্তুরমত ব্যবহার হয়।

যাঁহারা বিদেশে ভ্রমণ করিয়াছেন এবং সঙ্গতিপন্ন তাঁহারাও জাতীয় ভাবই বেশী পছন্দ করেন। তবে ইহাদের বাড়ীর হয়ত একটি কামরাতে খান কতক চেয়ার ও টেবিল রক্ষিত আছে। ইহা প্রায় বিদেশী আগন্তুকের জন্যই ব্যবহৃত হয়।

শান্তিপ্রিয়তা।—জাপানীরা চীৎকার করিয়া কথা বলে না বা কলহবিবাদ করে না। বহু জনতা হইলে আমাদের দেশে যেমন একটা সোরগোল হয় তথায় তাহা হয় না। এক পল্লীর গন্ধক উস্রবণে প্রায় চারি-পাঁচ শত লোকের একত্র সমাবেশ দেখিয়াছি, কিন্তু কোনরূপ শব্দ বা গোলমাল হয় নাই। প্রায় সাড়ে পাঁচ মাস যাবৎ বহু শহর ও গ্রামে ভ্রমণ করিয়াছি। এই সময়ের মধ্যে কোথাও ঝগড়া কলহ ও মারামারি দেখি নাই। একবার মাত্র উয়েনো ষ্টেশনে দেখিয়াছিলাম যে, এক যুবক এক অধস্তন রেল কর্ম্মচারীকে তিন-চারি ঘুঁসি মারিল। রেল-যাত্রীদের মধ্যে কিন্তু কেহই সেদিকে নজর দিল না। এইরূপ হইলে আমাদের দেশে যেমন তখনই সেই স্থানে ভিড় হয় তেমন কিছুই হইল না। দুই জন পুলিশ যুবককে ধরিয়া লইয়া চলিল এবং সেও ধীরে ধীরে চলিল। যদি বাইসাইকেল-যাত্রীরা ধাক্কা লাগিয়া পড়ে কেহ কাহাকেও কিছু বলে না। উভয়ে উঠিয়া গা ঝাড়িয়া নিজ নিজ গন্তব্য স্থানে চলিয়া

যাইবে। বহু জাপানী এখন বিভিন্ন দেশে গিয়া বসবাস করিতেছে, কিন্তু সর্ব্বত্র শান্তিপ্রিয় বলিয়া ইহাদের সুযশ, নিজেদের মধ্যে দলাদলি বা কলহ নাই এবং যে-দেশে থাকে সেই দেশীয়দের সঙ্গেও কোন মনোমালিন্যের সৃষ্টি করে না।

ধৈর্য্যশীলতা ও আত্মস্থতা।—পিতৃমাতৃবিয়োগ বা সন্তানবিয়োগ হইলেও অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন যে, জাপানীরা সাধারণতঃ ধীর ও আত্মস্থ থাকে, আকুলতা বা অধৈর্য্য প্রকাশ করে না। তাহারা মনে করে, তাহাদের নিজের দুঃখকষ্টের জন্য অপর কাহাকেও কোনরূপ অসুবিধায় ফেলা তাহাদের উচিত নয়। মিঃ কাসিন্স লিখিয়াছেন, 'এক সাধারণ শ্রমিক পরিবার তাঁহার বাড়ীর কাজকর্ম্ম করিত। সন্তানবিয়োগের জন্য নিজের গৃহে তাহাদের দুঃখ লক্ষ্য করিবার তাঁহার সুযোগ ছিল। কিন্তু যখন আসিয়া তাহারা তাঁহাকে এই সংবাদ দেয় তখন তাহাদের হাসি-হাসি মুখ।' শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ লিখিয়াছেন, 'তিনি যে বাড়ীতে অতিথিরূপে ছিলেন রাত্রিতে সেই বাড়ীর কর্ত্তার মৃত্যু হয়। কিন্তু গৃহিণী ও কন্যা চীৎকার করিয়া কাঁদে নাই বা কোনরূপ শব্দ করে নাই এবং পর দিন বিকাল পর্য্যন্ত তিনি জানিতে পারেন নাই যে, বাড়ীতে এমন একটা কাণ্ড হইয়া গিয়াছে।' এই গুণেই জাপানী পিতামাতা, এমন কি, বিধবা মাতাও একমাত্র পুত্রকে যুদ্ধে পাঠাইতে কাতর হয় না। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে টোকিও এবং ইয়োকোহামা শহর যখন ধ্বংস হয় এবং প্রায় দেড় লক্ষ লোক পুড়িয়া মরে তাহার পর দিনই টেলিগ্রাম করিয়া এই দুই শহর পুনর্গঠনের জন্য আমেরিকান ইঞ্জিনিয়ার আহ্বান করা হয় এবং যাহা হইয়াছে তাহার জন্য হা-হুতাশ করিয়া বৃথা সময় না কাটাইয়া সঙ্গে সঙ্গে পুনর্গঠনকার্য্যে হস্তক্ষেপ করা হইল। পাঁচ-ছয়

বৎসরের মধ্যেই এই দুই শহর কিরূপে পুনর্নির্ম্মিত হয় পূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করিয়াছি।

নিজের জন্য অপরকে অসুবিধায় ফেলা উচিত নয়, এই ভাব জাপানীদের মধ্যে নানা বিষয়ে প্রকাশ পায়। জাপানীরা যখন ভিন্নগ্রামে বা শহরে যায় তখন কাহারও বাড়ীতে আতিথ্যগ্রহণের প্রথা নাই। গ্রামেও হোটেল (ইয়াদোয়া) আছে। লোক ইয়াদোয়াতে থাকে। কেবল আহার বা পানীয় সরবরাহের রেস্তরাঁও অনেক গ্রামে আছে। ল্যাকার বা-গালার কার্য্যে ইহাদের ধৈর্য্যশীলতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। পর্দ্দায়-পর্দ্দায় রঙ লাগাইয়া চিত্র উঠান হয়। কোন কোন জিনিষ তৈয়ারি করিতে কুড়ি-পঁচিশ বৎসর সময় লাগে। একখানা পর্দ্দার কথা জানি যাহা নির্ম্মাণ করিতে সত্তর বৎসর লাগিয়াছে এবং ইহা ত্রিশ হাজার টাকায় বিক্রয় করা হইয়াছে।

চুজেঞ্জির পথে একটি জলপ্রপাত আছে। এই স্থানে শুনিলাম গড়ে প্রত্যহ একটি আত্মহত্যা হয়। লোকে নানা কারণে উপর হইতে লাফাইয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করে। কেহ হয় ত দুঃখে পড়িয়াছে তাই আর জীবন রাখিতে চায় না। যুবকযুবতী বিবাহ করিতে চায়, কিন্তু হয় ত আত্মীয়দের সম্মতি পায় না। তখন তাহারা আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়া উভয়ে একসঙ্গে লাফাইয়া পড়ে। পুলিসের পাহারা সত্ত্বেও এইরূপ ঘটিয়া থাকে। অন্যত্রও এইরূপ হয়।

হারাকিরির কথা অনেকেই শুনিয়াছেন। বসিয়া নিজের পেট কাটিয়া মৃত্যু আলিঙ্গন করিতে পারা বিশেষ ধৈর্য্যশীলতা ও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞতার পরিচয় দেয়। রুষ-জাপান যুদ্ধবিজয়ী বীর বৃদ্ধ জেনারেল নোগী এবং তাঁহার স্ত্রী সম্রাট মেজীর মৃত্যুতে আত্মহত্যা করেন। যুবকদের মধ্যে রাজভক্তি এবং দেশভক্তির শিথিলতা দেখিয়া এই

গুণের দৃষ্টান্ত রাখিয়া যাইবার জন্যই তিনি আত্মহত্যা করেন। তিনি তখনও দেশে পূজিত এবং অভিজাত বংশের সন্তানদের শিক্ষার বন্দোবস্তের ভার তাঁহার হাতে ছিল। ইতিহাসে দেখা যায় কোন কোন সৈন্যাধ্যক্ষ রাজার পক্ষে যুদ্ধ করিতে করিতে যখন দেখিল পরাজয় অবশ্যম্ভাবী তখন পরাজয় অপেক্ষা মৃত্যু আলিঙ্গন করিয়াছে, কেহ কেহ নিজে হারাকিরি করিয়া মৃত্যু বরণ করিয়াছে। শত্রুপক্ষের ষড়যন্ত্রে লাঞ্ছিত হইয়া এক সামন্ত আত্মহত্যা করেন। ইঁহার মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার জন্য অনুচর শামুরাইগণ রোনিন্ হইয়া মৃত্যু আলিঙ্গন করিয়াছে। এইরূপ সাতচল্লিশ জন রোনিনের মন্দির টোকিওতে আছে।

ভদ্রতা—শান্তিপ্রিয়তা হইতেই বুঝা যায়, নিজেদের মধ্যে ভদ্র ব্যবহারই জাপানীদের রীতি। কিয়োতোর সন্নিকটে সম্রাটের এক পুরাতন বাগানবাড়ী আছে। ইহা যখন দেখিতে যাই আমার সঙ্গে এক ইংরেজী অভিজ্ঞ জাপানী দোভাষী ছিল। একজন কেরাণী কিম্বা প্রহরী আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া বাগান দেখাইতেছিল। চলিতে চলিতে আমি বোধ হয় এই ব্যক্তি অপেক্ষা দুই-তিন পা বেশী অগ্রসর হইয়াছিলাম। দোভাষী আমাকে সমঝাইয়া দিল, আমার অগ্রে যাওয়া উচিত নয়। আবার ফুকুই শহরে এক দোকানে ঢুকিয়া এক রেশমী দ্রব্যের দাম জিজ্ঞাসা করিয়া বাহিরে আসিবা মাত্র দোভাষী বলিল, জিনিষ ক্রয় না করিলে দোকানে ঢুকিয়া বৃথা দোকানদারকে কষ্ট দেওয়ায় লোকের নিকট তাহার লজ্জাবোধ হইতেছে। রিক্সাওয়ালা বা ট্যাক্সিওয়ালা বা রেলের কুলি রীতি বা নিয়মানুযায়ী পারিশ্রমিক ব্যতীত কখনও বেশী চায় না। অনেক স্থলেই বেশি দিলে কুলিও ফিরাইয়া দেয়। কুলিরা এক প্রকার বিশেষ কোট পরে। এই কোট

দেখিলেই কুলি বা শ্রমিক বলিয়া চেনা যায়। একদিন টোকিওতে এক কুলিকে আমার গন্তব্য স্থানের রাস্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। সে এক মোড়ে আমাকে লইয়া গিয়া বলিয়া দিয়া চলিয়া গেল। কতকক্ষণ পরে দেখি সে আবার ফিরিয়া আসিয়াছে এবং আমাকে সঙ্গে করিয়া আমার গন্তব্য স্থানের নিকটে পৌঁছাইয়া দিয়া ফিরিয়া গেল। গৌর গোপীদাস বাবাজী নামক বৈষ্ণব ভেকধারী আমার পূর্ব্বপরিচিত এক বাঙ্গালী ভদ্রলোক জাপান দর্শনার্থে মাত্র অল্পদিন জাপানে থাকেন। তিনি টোকিও শহরে আমার সহিত দেখা করিতে যান। পনর-ষোল বৎসর বয়স্ক এক জাপানী বালককে তিনি রাস্তায় পথ জিজ্ঞাসা করেন। বালক অল্প অল্প ইংরেজী বুঝিত এবং বাবাজী জাপানী জানেন না দেখিয়া সমস্ত দিন বাবাজীকে লইয়া নানাস্থানে ঘুরিয়া সন্ধ্যার সময় তাঁহাকে ট্রেনে চড়াইয়া দিয়া বাড়ী ফিরিয়াছে। আমরা চারিজন ভারতীয় মিলিয়া ফুজি পাহাড়ে উঠিতে যাই। নামিয়া ফিরিবার সময় আমাদের টাকা কম পড়ে। ইহা বুঝিতে পারিয়া আমাদের কুলি বহু জিদ্ করে যে, আমরা যেন তাহার পারিশ্রমিক তখন না দিয়া টোকিও হইতে পাঠাইয়া দিই। দুইটি বালক আমাদের সঙ্গে জোটে এবং উপযাচক হইয়া তাহাদের টাকা আমাদের হাতে দেয়। পরে টোকিওতে তাহাদের বাড়ীতে গিয়া আমরা এই টাকা শোধ করিয়া দিই। আমি জাপানযাত্রার পূর্ব্বে রেঙ্গুনের জাপানী কন্সল্ জাপানের রেশম বুরোর ডাইরেক্টরের নামে এক পরিচয়-পত্র দেন। পরে জানিতে পারি, কন্সল্ মহাশয় নিজেও তাঁহার নিকট এক পত্র লিখিয়াছিলেন। এই বুরো ডাইরেক্টরকেও His Excellency বলিয়া চিঠিতে সম্বোধন করেন। ডাইরেক্টর মিঃ টি, ইসিগুরো আমার রেশমকার্য্য দেখিবার ও শিখিবার সমস্ত বন্দোবস্ত

করিয়া দেন। কারখানা, বিদ্যালয়, পরীক্ষাকেন্দ্র প্রভৃতি বহুস্থানে পরিচয়-পত্র দেন। আবার এই সকল স্থানের অধ্যক্ষ বা বিশেষজ্ঞগণ অপরের নিকট পরিচয়-পত্র দেন। "কয়েক জেলাতে" প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদের আপিস্ হইতে আমাকে সমস্তদিন মোটরগাড়ী এবং সঙ্গে লোক দিয়া কার্য্যের সুবিধা করিয়া দেওয়া হয়। সর্ব্বত্রই এইরূপ ভদ্রব্যবহার পাইয়াছি। যখন কোন জাপানী ভদ্রলোকের বাড়ী গিয়াছি অল্পক্ষণের মধ্যে গৃহিণী পুত্রকন্যাগণ পর্য্যন্ত আমাকে আপনার জন করিয়া লইয়াছেন। পল্লীতে কৃষক-পরিবারেও তাই। ভদ্রতা স্কুলের শিক্ষণীয় বিষয়গুলির মধ্যে গণ্য। উচ্চ বংশের বা পীয়ার-দিগের বংশের বালকবালিকার ভদ্রতা আরও বেশী।

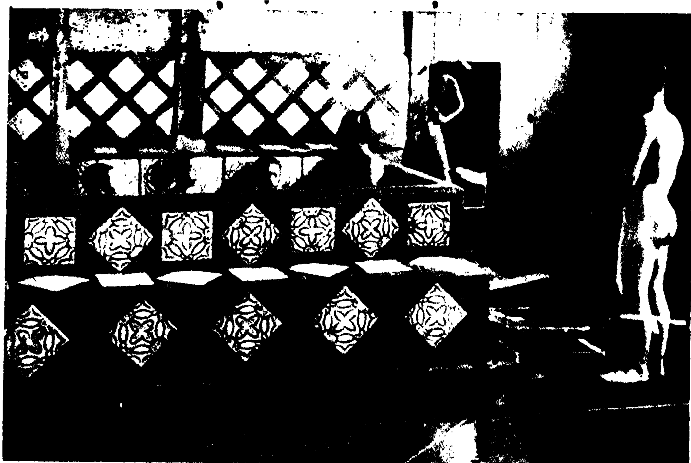
জাপানে ছোট-বড় সব কারখানাতেই কর্ম্মীদিগকে খাইতে ও থাকিতে দিবার রীতি। কোন কোন স্থানে দুই হাজার আড়াই হাজার কর্ম্মী বালিকা একত্রে বাস করে। বালিকারা সকলেই কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর। ইহাদের মধ্যে কলহবিবাদ হয় কি-না প্রশ্নটি কারখানার মালিকের নিকট আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইয়াছিল।

আধুনিক জাপানে ভিসিটিং কার্ড বা নিজের নামাঙ্কিত পরিচয়-সূচক কার্ড ব্যবহার অত্যন্ত বেশী এবং ইহা ভদ্রতার মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। আলাপ হইলেই কার্ড বদল করা হয়। আমি সঙ্গে একশত কার্ড লইয়া গিয়াছিলাম এবং জাপানে গিয়া আরও চারি শত ছাপাইতে হইয়াছিল। যখন জাপান পরিত্যাগ করি তখন মাত্র ত্রিশখানি সঙ্গে থাকে।

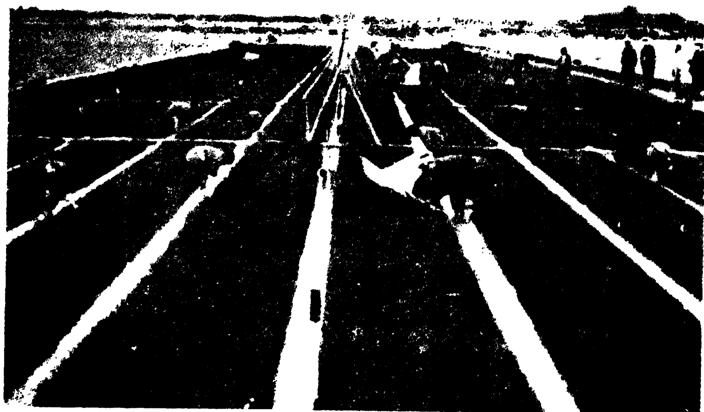
একাগ্রতা—সকল কাজই জাপানীরা একাগ্র হইয়া সমস্ত মন দিয়া করে। ইহা তাহাদের একটা জাতীয় গুণ। এই জন্য সকল কার্য্যেই ইহারা সাফল্য লাভ করে। নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়েও একাগ্রতার দরুণ জাতীয়

চরিত্রে একাগ্রতা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। ধানক্ষেতে আগাছার ফুল ফুটিলেও দলে দলে লোক গিয়া এই ফুলের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকে। এইরূপে চেরি গাছের ফুল দেখা উৎসবে পরিণত হইয়াছে। রেঙ্গুনের এক পুরাতন কন্সল্ টোকিওতে তাঁহার বাড়ীর বারান্দায় বসিয়া শরতের চাঁদ দেখিবার জন্য আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। বারান্দায় বসিয়া একদৃষ্টে চাঁদের দিকে তাকাইয়া চাঁদ দেখা এই নিমন্ত্রণের উপভোগ্য। গৃহস্থের বাড়ীতে বালিকারা চাকরাণীর কাজ করে। কাহাকেও কাজের জন্য কিছু বলিতে হয় না, বাড়ী ঝাড়াপোঁছা, সমস্ত জিনিষ যথাস্থানে গুছাইয়া রাখা এবং রান্না ইত্যাদি সমস্ত কাজ ঠিক সময়মত করা হয়, যেন এই দাসীরই বাড়ী এবং কাজ সমস্ত তাহার নিজেরই। জাপানে যাহারা আছেন সকলেই একবাক্যে ইহার যাথার্থ্য স্বীকার করেন এবং আমি নিজেও প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কোন এক বালিকাবিদ্যালয়ে ফুলদানিতে ফুল সাজান এবং দোয়াত-কলম-কাগজ কিরূপে সাজাইয়া রাখিতে হয় বা আগন্তুক কি গৃহস্বামীকে কিরূপে দিতে হয় তাহার শিক্ষা দেখিয়াছিলাম। ফুলদানিতে তিনটি চারিটি কি পাঁচটি ডাল সাজান হইবে। এই কার্য্যে কি একাগ্রতা তাহা যাহারা না দেখিয়াছেন তাঁহাদিগকে বুঝাইতে সক্ষম হইব না। থিয়েটারে হয় ত হাজার লোক উপস্থিত, কিন্তু কেহ কথা কয় না। একটি টুঁ শব্দ পর্য্যন্ত শোনা যায় না।

গাম্ভীর্য্য—বালকবালিকা, যুবাবৃদ্ধ সকলেই অতি গম্ভীর প্রকৃতির। রাস্তায় হাসিঠাট্টা করিতেছে বা গান গাহিয়া যাইতেছে এমন কেহ নজরে পড়ে নাই। কোন এক বিদেশী পর্য্যটক লিখিয়াছেন যে, জাপানীরা হাসিতে জানে না। কিন্তু সত্যসত্যই যে জাপানীরা আনন্দ উপভোগ করিতে জানে না তাহা নয়। বাড়ীতে একজনকেও



কোন একটি স্কুলের স্নানাগার পাঃ ১৬



বালকবালিকারা ধানের ক্ষেত হইতে পোকা ধরিতেছে

চা বা ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলে অনেক স্থলে 'গেইসা' বা নর্ত্তকীর নাচের বন্দোবস্ত করা হয়। নৃত্যগীত ছাড়া গেইসারা হাস্যরসের কথা কহিয়া অতিথির মনোরঞ্জন করে।

জাপানী সঙ্গীতে এখন ইউরোপীয় সুরের আমদানি হইতেছে। এই সুরেই স্কুলে বালকবালিকাদিগকে গান শেখান হয়। একবার প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক বিলাত প্রত্যাগত বিশেষজ্ঞের বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। খাওয়ার পর বিশেষজ্ঞ মহাশয়, তাঁহার পত্নী, পনর হইতে বিশ বৎসর বয়স্কা তিন কন্যা এবং দুই শিশু পুত্রের সহিত একত্রে গান গাহিয়া আমাকে শুনাইয়াছিলেন এবং তাঁহার পত্নী হাত-পা নাড়িয়া 'এক্‌শ্যন্‌-সং' গাহিয়াছিলেন।

সিনেমার বহু প্রচলন এবং ইহাদের সংখ্যা এখন প্রায় ১১৭২। এই সকল সিনেমাতে সামুরাইদের তরবারি লইয়া যুদ্ধ ইত্যাদি দেখিতে জাপানীরা খুব পছন্দ করে। উৎসবের সময় সাধারণ লোককে হাতে ছোট খঞ্জনীর মত বাদ্য বাজাইয়া দলে দলে যাইতে দেখিয়াছি, উন্মত্ততা দেখি নাই।

শ্রমসহিষ্ণুতা—ইহার একমাত্র পরিচয়ই যথেষ্ট। জাপানের অধিকাংশ কৃষকেরই চাষের জন্য বলদ বা ঘোড়া কিছুই নাই। কৃষক ও কৃষকপত্নী নিজেরাই কোদাল পাড়িয়া জমি চাষ করে। কৃষিতেও সেই একই একাগ্রতা। জমির এধার-ওধার দড়ি টানিয়া ধানের সারিগুলি ঠিক সোজাভাবে রোয়া হয়। ধান কাটিবার সময় একটি খড়ও নষ্ট হইতে দেওয়া হয় না। সমস্ত খড় বেশ গুছাইয়া সংগ্রহ করা হয়। ধানের ক্ষেত হইতে পোকা বাছিয়া উঠাইয়া ফেলা হয়। একই জমি হইতে বৎসরের মধ্যে পর-পর দুইটি, এমন কি, তিনটি ফসল উৎপন্ন করা হয়। আর যাহাতে জমির উৎপাদিকা শক্তি নষ্ট না হয়

তাহার জন্য খড়কুটা ছাইপাতালতা কোন কিছু বৃথা নষ্ট না হইতে দিয়া সারের গাদায় সারে পরিণত করিয়া জমিতে ব্যবহৃত হয়। শ্রমসহিষ্ণু বলিয়া প্রায় দেড়লক্ষ জাপানী কৃষক হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে এবং প্রায় আশী হাজার ব্রেজিলে সাদরে গৃহীত হইয়াছে।

আত্মনির্ভরশীলতা—ইহাও জাপানের জাতীয় গুণে পরিণত হইয়াছে। শিক্ষার এক প্রধান লক্ষ্য হইতেছে, শিশুকাল হইতে যাহাতে বালকবালিকারা আত্মনির্ভরশীল হয়। জাপানীদের মত শিশুপ্রিয় জাতি বোধ হয় খুব কমই আছে। কিন্তু শিশুদিগকে চোখে চোখে আহা-উহু করিয়া মানুষ করিবার রীতি নাই। ছোট ছোট শিশুরা পিঠের উপর কাপড়ের ঝুলিতে বাহিত হয় এবং তাহাদের মাথা ঘাড ভাঙ্গিয়া ঝুলিতেছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য করা হয় না। শিশুরা চলিতে শিখিবার সময় পড়িয়া গেলে আহা উহু করিয়া উঠাইয়া দেওয়া হয় না। দেশ ঠাণ্ডা হইলেও সকল শিশুবালকেরই চুল প্রায় নেড়া করিয়া ছাটিয়া দেওয়া হয়। উদ্দেশ্য শিশু কষ্টসহিষ্ণু হইবে।

জ্যেষ্ঠ পুত্রের উত্তরাধিকার জাপানের প্রথা। কেবল জ্যেষ্ঠ পুত্রই পিতার বিষয়াদি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সে অপর ভ্রাতা ভগ্নীদিগের লালনপালন ও শিক্ষার ভার অবশ্য পালনীয় বলিয়া গ্রহণ করে। বড় হইলে তাহাদিগকে আপন আপন পন্থা দেখিতে হয়। ইহাও আত্মনিভরশীলতার এক প্রধান কারণ।

আমাদের শিক্ষিতেরাও বাড়ী বা দেশ ছাড়িয়া বিদেশে যাইতে কাতর হয়। জাপানী কৃষকেরাও কোন্ সুদূর ব্রেজিল প্রভৃতি দেশে গিয়া বাস করিতেছে।

সাধারণতঃ স্থানান্তরে গেলেও কাহারও বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ না করিয়া ইয়াদোয়াতে থাকার প্রথা আত্মনির্ভরশীলতার পরিচয় দেয়।

কৃতজ্ঞতা—জাপানে স্মৃতিফলক দ্বারা স্মৃতিরক্ষার চলন খুব বেশী। ইহা দ্বারা জাতির কৃতজ্ঞতার ভাব প্রকাশ পায় এবং ভবিষ্যৎ বংশধরগণকে কাজে উৎসাহ প্রদান করা হয়। এই স্মৃতিফলক হয় ত মাত্র এক টুকরা প্রস্তরখণ্ড। একটি চিত্র দেওয়া গেল। এইরূপ স্মৃতিরক্ষার কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। এক ব্যক্তি এক স্থানে মিষ্টি আলু আনিয়া ইহার চাষের প্রবর্ত্তন করেন। গ্রামের যুবক মল্লযুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছে। একব্যক্তি কোন প্রয়োজনীয় বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিল বা সমবায় সমিতি স্থাপন করিয়াছিল। রুষ-জাপান যুদ্ধে কোন-একটি বিশেষ ঘোড়া হত হইয়াছিল। এই সকলের এবং এইরূপ আরও কতকিছুর স্মৃতি-প্রস্তর স্থাপিত হইয়াছে। চীন-রুষিয়ার যুদ্ধে হত লোকদিগের স্মৃতি প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই রক্ষিত আছে। দেশের ও জাতির উপকারী লোকদিগের জন্য ত সিন্তোমন্দির স্থাপিত হয়। সম্রাট মেজী এবং জেনারেল নোগীর জন্যও হইয়াছে। কিয়োতোর সন্নিকটে নোগী-মন্দিরের প্রাঙ্গণে নোগী মাঞ্চুরিয়ায় যুদ্ধের সময় যে-কুটীরে বাস করিয়াছিলেন, যে-বাঁশের খাটে ছেঁড়া চাটাইয়ে শুইয়াছিলেন সেই সমস্তই রক্ষিত হইয়াছে। এই প্রাঙ্গণেই এক মিউজিয়ম প্রতিষ্ঠা করিয়া নোগীর ব্যবহৃত সমস্ত জিনিষ,—ঘোড়ার জিন, জামাকাপড়, অসি, জুতা, ছাতা, দোয়াতকলম এবং তাঁহার বাঁধান দাঁত পর্য্যন্ত রক্ষিত হইয়াছে।

অপর নানা বিষয়েরও স্মৃতি রক্ষিত হয়। কোন এক ব্যক্তি কুড়ি লক্ষবার 'নমি অমিদা বুৎসু' জপ করিয়া এবং অপর কোন এক ব্যক্তি তীর্থ হইতে ফিরিয়া একটি স্মৃতিফলক রাখিয়াছে। আর এক ব্যক্তি কন্যার জন্মতারিখে এক বৃক্ষ রোপণ করিয়াছে।

পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস—জাপানে টেলিগ্রাফ পাঠাইলে ফি'র

জন্য কোনরূপ রসিদ দিবার রীতি নাই। জমিদার প্রজার নিকট খাজনা-স্বরূপ ধান দেখিয়া লয় না। প্রজা ধানের গোলায় দেয় ধান রাখিয়া দিয়া যায়। কোন কোন স্থানে বাক্যহীন ব্যবসা বা ক্রয়বিক্রয় বা জিনিষপত্র বিনিময়ের প্রথা আছে। কেহ পাহাড়ের এক স্থানে হয়ত আলুর জন্য ধান রাখিয়া আসে এবং এই ধান লইয়া আলু বিক্রয়কারী আলু রাখিয়া যায়। লোকের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ প্রায়ই হয় না। টোকিওর অনেক দোকানে দেখিয়াছি বড় বড় টেবিলের উপর মোজা-গেঞ্জি ইত্যাদি বহু দ্রব্য সজ্জিত আছে। ক্রেতা পছন্দ করিয়া বিক্রেতার নিকট গিয়া দাম দিয়া যাইতেছে। রিক্সা, ট্যাক্সি, কুলি, ইত্যাদির সহিত দাম কষাকষি নাই। জাপানের বাড়ীগুলি যেরূপে তৈয়ারি চোর অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারে; কিন্তু চোরের উপদ্রব প্রায় শুনা যায় না বলিলেই হয়।

সহযোগে কাজ—সকলে মিলিয়া একত্রে সহযোগে কাজ করিবার ক্ষমতা ও প্রবৃত্তি জাপানীদের সকল গুণের প্রধান। ইহা অপরাপর নানা গুণগুলির সমবায়ে গড়িয়া উঠিয়াছে, যথা শান্তিপ্রিয়তা, পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস ও ভদ্রতা। ইহাদের মধ্যে ভদ্রতাই প্রধান। কাহারও মনে অসন্তোষ উৎপাদন না করিয়া সকলের সহিত মিশিতে পারার নাম ভদ্রতা। ভব্যতাজ্ঞান সহযোগের ভিত্তি। গবর্ণমেণ্ট নানারূপ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানাদি দ্বারা সহযোগ বর্দ্ধিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছে ও পাইতেছে। ইহাই হইল উন্নতির প্রধান ভিত্তি। সাধারণ লোকদিগের মধ্যে প্রচলিত কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়া ইহার পরিচয় দিতেছি।

গ্রামে গ্রামে যুবক, বয়স্ক, স্ত্রীলোক, কৃষক ও রেশমকীট-পালনকারী-দিগের বিভিন্ন সমিতি আছে। ইহা ছাড়া রেশমগুটী, সুতা,

ধান, গম, সার, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি নানাবিধ জিনিসের ক্রয়বিক্রয়ের বহু সমিতি আছে। সমিতি গঠন করিয়া সহযোগে কার্য্য করাই এখন রীতি হইয়াছে। শিক্ষকেরা সমিতি গঠন করিয়া কেবল শিক্ষার বিষয় আলোচনা করেন। যাত্রীরা সমিতিগঠন করিয়া তীর্থে যায়।

কোন কোন স্থানে প্রাতঃকালে উঠিবার সমিতি আছে। এই প্রাতরুত্থান সমিতির কার্য্য হইল সভ্যদের প্রত্যেককে পালাক্রমে প্রতিমাসে ঠিক সময়ে উঠিয়া অপর সকলকে ডাকিয়া উঠাইতে হইবে। সকলে মিলিয়া তারপর নির্দ্দিষ্ট সময় ব্যায়াম করিয়া হয়ত সিন্তো-মন্দিরে গিয়া প্রার্থনা করিয়া দিনের কাজ আরম্ভ করে।

যুবক সমিতি গ্রামের 'ফায়ার ব্রিগেডে'র কার্য্য করে। অগ্নির সঙ্কেতসূচক বাদ্য বা ঘণ্টা বাজিলেই সকলে আসিয়া জড় হইয়া আগুন নিবায়। কোন গৃহস্থের যুবকপুত্র যদি বাধ্যতামূলক যুদ্ধ শিক্ষার জন্য যায় তাহা হইলে এই সমিতি গৃহস্থের চাষ উদ্ধার করিয়া দেয়। রুষ-জাপান যুদ্ধের সময় অনেক সমিতি গুপ্তভাবে না জানাইয়া লোকের জমি চষিয়া দিয়াছে।

প্রত্যেক দিন এক পয়সা বাঁচাইয়া গ্রামের কৃষকেরা হাজার হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া হয় ধানের গোলা করিয়াছে, কি অপর কোন হিতকর কার্য্যে লাগাইয়াছে এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক দেখা যায়। প্রায় পাচ শত ঘর বাসিন্দা আছে এমন এক গ্রামের বালকবালিকারা রবিবারে বাড়ী বাড়ী গিয়া স্বেচ্ছাপ্রদত্ত অর্থ সংগ্রহ করিয়া পাঁচ বৎসরে ষাট হাজার টাকা জমাইয়াছে বলিয়া শুনা যায়।

যখন গ্রামের কোন গৃহস্থের ঘর পুড়িয়া যায় অনেকে চাঁদা তুলিয়া আংশিক সাহায্য করে। কৃষকেরা মিলিয়া একত্রে বীজধান জন্মায়।

কৃষকদের টুকরা টুকরা জমি নানা স্থানে ছড়ান অবস্থায় থাকায়

দরুণ যে ক্ষতি ও অসুবিধা হয় তাহা নিবারণের জন্য জমিগুলি একত্র করিয়া পুনর্বণ্টন দ্বারা যাহাতে এক কৃষকের জমি একই স্থানে হয় তাহার বন্দোবস্ত এখন জাপানের প্রায় সর্ব্বত্রই হইয়াছে।

বুসিদো—পূর্ব্বে সামুরাইদিগের কথা উল্লেখ করিয়াছি। ইহাদের ব্যবসা কেবল যুদ্ধ, অতএব সাহস, শারীরিক বল এবং পরাজয় অপেক্ষা মৃত্যুর শ্রেয়তা ইহাদের উপাস্য ছিল। এই গুণাবলির সহিত প্রভুর আজ্ঞানুবর্ত্তিতা, ভদ্রতা, ন্যায়পরতা, উদারতা, সহিষ্ণুতা, আত্মসংযম, নম্রতা এবং দেশাত্মবোধ ধর্ম্মের অঙ্গীভূত বলিয়া সামুরাইগণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সামুরাইদিগের সমস্ত গুণাবলির সমষ্টিকে 'বুসিদো' বলা হয়। বুসিদোর অভাব দৃষ্ট হইলে সামুরাইয়ের বংশধরকেও সামুরাইশ্রেণী হইতে বিচ্যুত হইতে হইত। সাধারণ লোকদের সহিত ব্যবহারে ঔদ্ধত্য থাকিলেও এই সকল উচ্চ গুণাবলির জন্য সামুরাই-শ্রেণী লোকের আদর্শস্থানীয় হইয়া উঠিয়াছিল। পূর্ব্বে কেবল সামুরাইগণই যুদ্ধ করিতেন। মেজী অব্দে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে দেশের সমস্ত জাতিভেদের বা শ্রেণীভেদের কারণ দূর করিয়া জাতির সকলেই সমান এই নীতি ঘোষণা ও গ্রহণ করা হয়। জাতির প্রত্যেক বালককে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়। অতএব এখন সকলেই সামুরাই এই ভাব প্রত্যেকের মনে জাগাইয়া দেওয়া হয়। জাপানীরা মনে করে যে, তাহাদের বুসিদোর বলেই তাহারা চীন ও রুষকে পরাজিত করিয়াছে এবং এখন তাহারা পৃথিবীর যে-কোন জাতিকে পরাস্ত করিতে পারে। এই বুসিদো জাপানের প্রধান সম্পদ।

ধর্ম্ম—ধর্ম্মসম্বন্ধে জাপানীরা অতি উদার। একই গৃহস্থে পিতা হয় ত খৃষ্টান, মাতা বৌদ্ধ এবং সন্তান সিন্তো। ইহারা বুঝিয়াছে

ধর্ম্ম অর্থাৎ জগৎপিতা ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ নিজস্ব ও আন্তরিক। ঈশ্বরের নিকট পৌছিবার নিশ্চয় নানাবিধ পথ আছে এবং যাহার যে-পথে ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি সে সেই পথে যাইতে পারে—সে-পথ বুদ্ধদেব বা যীশু খৃষ্ট বা অপর যে-কেহ প্রদর্শন করিতে পারে। এই কারণে জাপানে ধর্ম্মের নামে আমাদের দেশের ন্যায় অধর্ম্ম ও পাপের সৃষ্টি হয় না এবং মনোমালিন্যও হয় না। আমাদের দুরবস্থা কতটা এই পাপের ফল তাহা চিন্তার বিষয়।

জাপানে সিন্তো, বৌদ্ধ ও খৃষ্ট ধর্ম্মের প্রচলন আছে। যাহার যাহা ইচ্ছা গ্রহণ করিতে পারে। দেশের আইন-কানুনে ও সমাজে কোন বাধানিষেধ নাই। এই কারণে বিদ্যালয়গুলিতে কোন ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া হয় না। কিন্তু নীতিশিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। কন্‌ফুসিয়স্ প্রচলিত নীতিগুলি (ভুলক্রমে কন্‌ফুসিয়স্ ধর্ম্মও বলা হয়) জাপানীদের ব্যবহারিক জীবনের ভিত্তি। ইহাতে প্রভুর সহিত অনুচরের, পিতামাতার সহিত পুত্রকন্যার, বন্ধুর সহিত বন্ধুর, এইরূপ মানুষের সহিত মানুষের সম্বন্ধ ও ব্যবহার সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হয়। এই নীতিগুলিকে ধর্ম্ম হইতে পৃথক করিয়া জাপান অতিশয় বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছে।

সিন্তো অর্থে দেবতাদিগের পথ। ইহাই জাপানের আদিম ধর্ম্ম। ইহার মর্ম্ম হইতেছে,—সূর্য্য ইত্যাদির পূজা অর্থাৎ প্রকৃতিপূজা এবং পূর্ব্বপুরুষ পূজা। সমস্ত জাপানী এক বৃহৎ পরিবার বলিয়া গণ্য এবং এই পরিবারের কর্ত্তা সম্রাট বা মিকাডোর প্রতি সম্মান, মিকাডোর আজ্ঞানুবর্ত্তিতা, মিকাডোর পূর্ব্বপুরুষ সূর্য্যদেবীর পূজা এবং দেশের বড় বড় যোদ্ধা ও উপকারকের পূজা সিন্তো ধর্ম্মের মূল। পূর্ব্ববর্ণিত ঈসের মন্দিরে সূর্য্যদেবীর এবং দর্পণ, তলোয়ার ও হার রূপ

দেবনিদর্শনগুলির পূজার গুরুত্ব এখন বুঝা যাইবে। সিন্তো ধর্ম্মই এখন রাজধর্ম্ম এবং প্রায় সকল কার্য্যেই সিন্তো পুরোহিতগণ যথোচিত পূজা ইত্যাদি সম্পাদন করেন। একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। সম্রাটের রাজ্যাভিষেকের সময় ব্যবহৃত চালের জন্য বিশেষ ক্ষেত্রে ধান্য রোপিত হয়। প্রথমে দেবতাদিগকে নৈবেদ্য দান করা হয়, দেবতাদিগকে নৈবেদ্য গ্রহণের জন্য আহ্বান করা হয় এবং গ্রহণের পর ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ করা হয়। তারপর নৈবেদ্য সরাইয়া লইয়া বিতরিত হয় এবং ধানের চারাগুলি রোপিত হয়। রোপণকারিগণ প্রাতঃকালে স্নান করিয়া শুদ্ধভাবে এই কার্য্য সম্পাদন করে। এই কার্য্যের তত্ত্বাবধারণ করেন ফ্রক কোট্ ও হ্যাট পরিহিত প্রাদেশিক পরীক্ষাকেন্দ্রের অধিনায়ক। এমনি করিয়া জাপান প্রাচ্যের ধর্ম্মভাবের সহিত প্রতীচ্যের বিজ্ঞানের সংমিশ্রণ করিয়াছে। আমাদের কথায় বলে পিতার পুণ্যে পুত্রের জয়। জাপানীদেরও বিশ্বাস পিতৃপুরুষদের সৎকার্য্য ও পুণ্যের প্রভাব গৃহস্থে বর্ত্তমান থাকে। পূর্ব্বপুরুষদিগের পূজার জন্য গৃহে স্থান আছে। পূর্ব্বপুরুষদিগের নামাঙ্কিত ফলক এই স্থানে রক্ষিত থাকে। সম্রাট মাৎসুহিতোর (মেজির) জন্য সিন্তো মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জেনারেল নোগী রুষ-জাপান যুদ্ধের অধিনায়ক ছিলেন এবং সম্রাট মেজির মৃত্যুর পর তিনি ও তাঁহার স্ত্রী আত্মহত্যা করিয়া মেজির অনুগমন করেন। টোকিওতে ইঁহার জন্য এক বৃহৎ সিন্তো মন্দির নির্ম্মিত হইতেছে

এখন জাপানে ১,১২,১৯১ সিন্তো মন্দির এবং ১৪,৯৮৫জন পুরোহিত আছে। ইহাদের মধ্যে ১,০৮৫ মন্দির ২,৪৪৯ পুরোহিত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পরিপোষিত। গবর্ণমেণ্ট অন্য ধর্ম্মের মন্দির বা পুরোহিত পোষণ করেন না।



গ্রাম্য বালিকারা ছোটি ভাইবোনকে

লইয়া বেড়াইতেছে

ভারতে বৌদ্ধধর্ম্ম যখন তান্ত্রিক হইয়া পড়িয়াছে এবং বহু দেবদেবীর পূজা গ্রহণ করিয়াছে সেই সময়েই এই ধর্ম্ম জাপানে আনীত বলিয়া বোধ হয়। বহু হিন্দু দেবদেবী এখনও জাপানে বর্ত্তমান আছে।

জাপানে এখন বৌদ্ধধর্ম্মের বারটি সম্প্রদায় আছে। মন্দিরের সংখ্যা প্রায় ৭২,০০০ এবং পুরোহিতের সংখ্যা প্রায় ৫৫,০০০। এই সকল প্রতিষ্ঠান জনসাধারণের দানের উপর নির্ভর করে।

খৃষ্টধর্ম্মের এখন প্রোটেষ্ট্যাণ্ট, রোমান ক্যাথলিক, ও গ্রীক সম্প্রদায়ের বহু গীর্জ্জা আছে এবং সাল্‌ভেসন্ আর্মি, ইয়ং মেন্স্ এসোসিয়েসন্ প্রভৃতির কার্য্য চলিতেছে। প্রোটেষ্ট্যাণ্টদিগের গীর্জ্জার সংখ্যা প্রায় ১,৫০০ এবং এই ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা প্রায় ১,৫৫,০০০; রোমান ক্যাথলিক গীর্জ্জার সংখ্যা প্রায় ২০০ এবং এই ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা প্রায় ৭৭,০০০। গ্রীক চার্চ্চের গীর্জ্জার সংখ্যা ১১৪ এবং এই মতাবলম্বীর সংখ্যা প্রায় ৭৪,০০০।

ধর্ম্মসম্বন্ধে কোন দলাদলি, রেষারেষি বা কলহবিবাদ নাই। সকল জাপানীরই জীবন কন্‌ফুসিয়স্-নীতি দ্বারা গঠিত ও চালিত এবং সিন্তো ধর্ম্ম দ্বারা অনুপ্রাণিত। বৌদ্ধ বা খৃষ্টধর্ম্ম সিন্তোধর্ম্মের সহিত সংমিশ্রিত বলিয়া বোধ হয়। ধর্ম্ম সম্বন্ধে গোঁড়ামি আদৌ নাই। খাদ্য, আচার-ব্যবহার, এমন কি, জন্ম-বিবাহ-মৃত্যুর অনুষ্ঠানাদি ধর্ম্মাধীন নহে। খাদ্য সম্বন্ধে বিচার এখন নাই বলিলেই হয়। অতি অল্প লোকই এখন দেখা যায় যাহারা গোমাংস বা মাংস, মৎস্য খায় না। কিন্তু ধর্ম্মভাব সকলেরই ভিতর বর্ত্তমান। এই ধর্ম্মভাবের সহিত পাশ্চাত্যের আধুনিক বিজ্ঞানের সংমিশ্রণ হইয়াছে। ভারতের হিন্দুর মত হাজার দেবদেবীতে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা এবং এমন কি, অনেক অন্ধ বিশ্বাসও রহিয়াছে। শিক্ষিত জাপানী হ্যাট

কোট পরিয়া মন্দিরের পাশ দিয়া যাইতে যাইতে হ্যাট খুলিয়া মস্তক নত করিয়া শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে। মন্ত্রীরা মন্দিরে গিয়া পূজা করে। ঘরে ঘরে পূর্ব্বপুরুষ ও দেবদেবীর পূজা হয়। মন্দির হইতে সকলেই কবচ গ্রহণ করে। কিওতোর এক মন্দিরে জীবন্ত শেয়ালের এবং শেয়ালের প্রস্তর মূর্ত্তির পূজা হয়। মানসিক শোধ করিয়া অনেকেই তোরণ দেয়। রাস্তার পাশে ষষ্ঠীর প্রতীক একখানা প্রস্তরখণ্ডের পূজা করিতে দেখিয়াছি। জাপানে যমরাজের মূর্ত্তির পূজা যেমন দেখিয়াছি ভারতের কোথাও তেমন



যমরাজের মূর্ত্তি

হয় বলিয়া জানি না। এই সকলের সঙ্গে সঙ্গে জাপান পাশ্চাত্যের যাহা-কিছু আধুনিক কালের উপযোগী ও প্রয়োজনীয় তাহা গ্রহণ করিয়াছে। কেহ মনে করিবেন না যে, ভারতের হিন্দুর মূর্ত্তিপূজা বা হাজার দেবদেবীর পূজা ভারতের উন্নতির প্রতিবন্ধক। আমার মনে

হয়, জনসাধারণের ধর্মভাব জাতির সম্পদ। ধর্মের নামে যে সকল গ্লানি আছে এবং ক্রমে জন্মে তাহা কেবল প্রকৃত শিক্ষার দ্বারাই দূর হওয়া সম্ভব। জাপানে বহু পরিমাণে ইহা হইয়াছে। আমাদের দেশে অন্ধবিশ্বাসাদি দূর হওয়ার পূর্ব্বে আমাদের উন্নতি নাই এরূপ যদি কেহ মনে করেন তিনি ভ্রান্ত।

জাপানের অন্ধবিশ্বাসের দুই-একটা উদাহরণ এখানে দেওয়া যাইতেছে। গৃহে আগুন, চোর এবং রোগ নিবারণের জন্য বাড়ীতে কবচ ঝোলান হয়। বাড়ীর বিড়ালটি হারাইলে পর্য্যন্ত তাহাকে ফিরাইয়া পাইবার জন্য কবচ লাগান হয়। কিওতোর এক মন্দিরে বহু ছোট ছোট প্রস্তরমূর্ত্তি সাজান আছে। শিশু সন্তানের মৃত্যু হইলে মাতা মৃত শিশুর জামা কিংবা অপর যে-কোন পরিধেয় লইয়া যে-মূর্ত্তিটি মৃত শিশুর আকারের মত বোধ হয় তাহাকে পরাইয়া দিয়া বিশ্বাস করে যে, তাহার আর কোন শিশুর মৃত্যু হইবে না। সন্তানকামনায় জোড়া মূলা মন্দিরে প্রদান করা হয়। কোন স্থানে রোগ প্রবল হইলে আমাদের দেশে যেমন কালীপূজা ইত্যাদি করিয়া উহা তাড়াইবার চেষ্টা করা হয় জাপানেও সেইরূপ প্রথা আছে। বৃষ্টি না হইলে টাগ্-অফ্-ওয়ারের মত দড়ি টানাটানি করা হয়। ব্রহ্মদেশেও এই প্রথা আছে। কখনও কখনও পাহাড়ের উপর উঠিয়া চীৎকার করিয়া বৃষ্টিকে আহ্বান করা হয়। কোন কোন স্থানে দূরস্থিত কোন জলাশয়ের জল পাত্রে ভরিয়া কোথাও না থামিয়া নিজগ্রামে আনিবার প্রথা আছে। হয়ত দুই-তিন দিন দিবারাত্রি না থামিয়া এই জল আনা হয়। যদি কোথাও বিশ্রাম করা হয় এবং পাত্রের জল সেইখানে পড়ে তাহা হইলে সেইখানেই বৃষ্টি হইবে এই ভয়। কোথাও আবার কোন দেবমূর্ত্তিকে গলায় দড়ি বাঁধিয়া জলে ফেলিয়া

দেওয়া হয় এবং যতদিন না বৃষ্টি হয় ততদিন তোলা হয় না। আবার কোথাও গরুর মাথা কাটিয়া ও ফাটাইয়া জলপ্রপাতে ফেলিয়া দেওয়া হয়। ইহাতে দেবতা রুষ্ট হইয়া বারি বর্ষণ করে।

দেশাত্মবোধ—প্রত্যেক জাপানী মনে করে, দেশের ও জাতির মঙ্গলামঙ্গল তাহারই হাতে এবং সকল সময়েই সে এমন কার্য্য করিতে দ্বিধা বোধ করে যাহাতে জাপান বা জাপানীর অখ্যাতি হয়। আর জাপানীর বা জাপানের যাহাতে অনিষ্ট বা ক্ষতি হয় এমন যাহাই হোক নিবারণ করিতে সে সর্ব্বদাই তৎপর। আমেরিকার যুক্তরাজ্যে এখন সকলকে বসবাসের অনুমতি দেওয়া হয় না। ইউরোপীয়দিগের পক্ষে নিয়ম করিয়া দেওয়া হইয়াছে কোন্ দেশের কত জনকে বৎসরে গ্রহণ করা হইবে। এসিয়াবাসীদিগকে গ্রহণ করা হয় না। প্রত্যেক জাপানী ইহা জাপানের অপমান বলিয়া মনে করে। কয়েকজন শিক্ষিত জাপানী নিজেই কথাবার্ত্তার সময় এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছে এবং বলিয়াছে যে, যদি একজন মাত্র জাপানীকে গ্রহণ করা হইত তাহা হইলে তাহাদের অভিযোগের কোন কারণ থাকিত না। আমেরিকার সহিত ভবিষ্যতে বিবাদের ইহাই এক প্রধান কারণ হইয়া রহিয়াছে।

উন্নতির সূচনা ও উপায়

কমোডোর্ পেরীর কামান গর্জ্জন হইতেই জাপানের উন্নতির সূচনা। যখন জাপানীরা নিজেদের গণ্ডীর বাহির হইয়া ইউরোপ ও আমেরিকার সহিত নিজেদের অবস্থার তুলনা করিয়া পার্থক্যের পরিমাণ বুঝিতে পারিল তখন তাহারা দেশের উন্নতি করিয়া ইহাদের সমকক্ষ হইবার উদ্দেশ্যে কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গেল। সকল বিষয়ের শিক্ষার জন্য বিদেশ হইতে শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া আনিল,



স্মৃতিস্তম্ভরূপে ব্যবহৃত প্রস্তরখণ্ড

আধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রণালী গ্রহণ করিল এবং শিক্ষার জন্য সঙ্গে সঙ্গে দলে দলে যুবকদিগকে বিদেশে পাঠাইতে লাগিল। যুবকগণ বিদেশ হইতে শিক্ষিত হইয়া ফিরিয়া আসিলে তাহাদিগকে নানা কার্য্যে নিযুক্ত করিল। বিদেশী শিক্ষক অধ্যাপক এখনও কোথাও কোথাও আছে। কূপমণ্ডুকত্বের অনিষ্টকারিতা জাপান এমন অনুভব করিয়াছে যে, যাহাতে ইহা না জন্মে সকল সময়েই সেই দিকে লক্ষ্য রাখে। অধ্যাপক, বৈজ্ঞানিক, ইঞ্জিনিয়র, টেকনিক্যাল স্কুল, কলেজের শিক্ষক প্রভৃতি যাঁহারাই জ্ঞান ও কলাকৌশল বৃদ্ধির আলোচনা করেন, তাঁহাদিগকে মধ্যে মধ্যে ইউরোপ আমেরিকায় পাঠাইয়া ঐ সকল কার্য্যের কেন্দ্রস্থলগুলি পরিদর্শন করাইবার বন্দোবস্ত প্রত্যেক বিভাগেই আছে। ইহার জন্য প্রত্যেক বিভাগে টাকা মঞ্জুর থাকে এবং বিশেষজ্ঞদের সকলকেই যাইতে বাধ্য করা হয়। বিদেশে বাসকালে তাঁহাদের বেতনের সম্যক বা অর্দ্ধেক তাঁহাদের পরিবারকে দেওয়া হয় এবং গবর্ণমেণ্ট বাহিরে যাওয়া-আসা-থাকার সমস্ত খরচ বহন করেন। বিদেশে থাকিবার কালে জাতির সম্মানের জন্য ভ্রমণ, আহার ও বাসের প্রথম শ্রেণীর খরচ দেওয়া হয়। ব্যবসাদারেরাও ইহার উপকারিতা বুঝিয়াছে। ফুকুই জেলার রেশমবয়নকারী তন্তুবায়-সমিতি প্রত্যেক বৎসর একজন শিল্পী ও একজন ব্যবসায়ে অভিজ্ঞ লোককে বিদেশে পাঠায়। ইহারা কোথাও এই শিল্পের নূতন যন্ত্রাদির উদ্ভব হইয়াছে কি-না লক্ষ্য রাখে এবং সঙ্গে সঙ্গে উন্নত প্রণালী অবলম্বন করে। আর ব্যবসার জন্য লোকের চাহিদা কিরূপ তাহা লক্ষ্য করিয়া যাহা-কিছু নূতন পন্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন বিবেচনা করে, অবলম্বন করে। এই সমিতির প্রতিনিধিরা পৃথিবীর সমস্ত দেশ ভ্রমণ করিয়াছে। গবর্ণমেণ্টের ব্যবসা ও শিল্প-

বিভাগ প্রত্যেক বৎসর বিদেশে লোক পাঠায় এবং সকল দেশেই জাপানী কন্সলরাও এই দিকে লক্ষ্য রাখে।

পেরীর আগমনের পর, সম্রাট যে দেবতার অংশসম্ভূত জনসাধারণের মনে এই বিশ্বাস ও ভাগ্যক্রমে মেজির মত সম্রাট লাভ, জাপানের উন্নতির পথ খুলিয়া দিল। ইহার সহিত প্রত্যেক জাপানীর দেশাত্মবোধ মিলিয়া এমন সুযোগ উপস্থিত করিল যে, সকল দিকেই উন্নতির জোয়ার বহিয়া গেল। যে-কোন জাপানীর সহিত কথা কহিয়াছি, তাহারই মনে যেন সর্ব্বদা জাগিতেছে যে, জাপান ক্ষুদ্র দেশ, সকলেই যদি সাধ্যানুসারে চেষ্টা না করে তাহা হইলে দেশ উন্নত হইতে পারে না। জাপান বা জাপানীর কোন তুচ্ছ বিষয়েও নিন্দা প্রত্যেক জাপানীর মনে ব্যথা দেয় এবং সুখ্যাতি কত আনন্দ দেয় স্পষ্টই তাহা বুঝা যায়। শিক্ষাপ্রণালী এমন ভাবে চালিত যে, দেশাত্মবোধ জাগরিত রাখে এবং বর্দ্ধিত ও দৃঢ় করে। দেশের সকল লোকের টানে দেশ উন্নত হইল। একাগ্র ইচ্ছা হইলেই কার্য্যের জন্য লোকের অভাব হয় না এবং কার্য্যোপযোগী লোকও জন্মে বা গড়িয়া উঠে। কার্য্যত হইলও তাহাই। উন্নত দেশগুলির শিক্ষাপদ্ধতি, শাসনপদ্ধতি এবং শিল্পবাণিজ্য প্রভৃতি সকল বিষয়ই পর্য্যালোচনা করিবার জন্য সম্রাট বহু বিজ্ঞ লোককে দেশান্তরে পাঠাইলেন এবং যাহা উন্নত মনে করিলেন তাহাই গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার আজ্ঞা লোকে দেবাজ্ঞা বলিয়া মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিল। উন্নত শাসন-শিক্ষা-শিল্পপ্রণালীর কথা ছাড়িয়া দিয়া যেখানে মতদ্বৈধ উপস্থিত হওয়া সম্ভব এমন দুই-একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। জাপানী অঙ্কে ১, এক দাঁড়ি, ২, দুই দাঁড়ি, ৩ তিন দাঁড়ি দিয়া এবং অপর অঙ্কও দাঁড়ির ঘোর-ফের করিয়াই লিখিতে হয়। অতএব সংখ্যা লেখা এক জটিল

ব্যাপার। ইহা ত্যাগ করিয়া। ১, ২, ৩ প্রভৃতি ইংরেজী অঙ্ক গ্রহণ করা হইয়াছে এবং শিশুরা ইহাতেই অঙ্ক আরম্ভ করে। ইংরেজী হিসাবে সপ্তাহ ও মাস এবং ১লা জানুয়ারী হইতে বৎসর গণনা গ্রহণ করা হইয়াছে। জাতির দৈহিক বলের জন্য গো-মাংস ভক্ষণ প্রচলন এই সময়েই হয়। কেহ কেহ বলেন, ইহার জন্য অনেক স্থলে ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগপূর্ব্বক মাংস মুখে পুরিয়া দেওয়া হইয়াছে। এখনও জাপানে অনেক পরিবার এবং অনেক গ্রামে এমন হোটেল আছে যেখানে গোমাংস ব্যবহৃত হয় না। . .

এখন উন্নতির উপায়গুলির সংক্ষেপে বর্ণনা করা যাইতেছে।

১। সার্ব্বজনীন শিক্ষা

উন্নতির জন্য যে-সকল উপায় অবলম্বন করা হইল তাহার মধ্যে প্রধান হইতেছে সকল বালকবালিকার বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা। জার্ম্মানীর অনুকরণে এই শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলন করা হইয়াছে। জাপানী-গণনা অনুসারে সাত বৎসর বয়স্ হইলেই প্রত্যেক বালকবালিকা স্কুলে যাইতে বাধ্য। জাপানের বৎসর আরম্ভ হয় ১লা জানুয়ারী হইতে। যে শিশুর ৩১-এ ডিসেম্বর জন্ম হয়, পরদিন ১লা জানুয়ারী তাহার বয়স দুই বৎসর গণনা করা হয়। এই গণনা অনুসারে সাত বৎসর বয়স হইবার পর যদি বালকবালিকা-দিগকে স্কুলে পাঠান না হয় তাহা হইলে পিতামাতার দণ্ড হয়। সাত বৎসর বয়সের পূর্ব্বে শিশুদিগের শিক্ষার জন্য বহু কিণ্ডার গার্টেন স্কুল আছে। পুস্তকের শেষে সকল রকম শিক্ষায়তনের সংখ্যা দিয়াছি। প্রাথমিক বা কমন্ স্কুলে বালকবালিকাকে বেতন দিতে হয় না। পল্লীর মধ্যে যত বড় বড় বাড়ী নজরে পড়ে প্রায় সমস্তই স্কুল-গৃহ।

উহার সঙ্গে খেলিবার প্রশস্ত মাঠ। প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষণীয় বিষয়ের মোটামুটি বিবরণ দিতেছি,—

শিশুরা বাড়ীতে অক্ষর-পরিচয়ের পর স্কুলে যায় এবং একেবারেই পুস্তক পাঠ আরম্ভ করে। প্রথম দুই বৎসরের বিষয়—নীতি শিক্ষা; লিখন, পঠন ও রচনা; পাটীগণিত; ড্রইং ও চিত্রাঙ্কন, সঙ্গীত; ব্যায়াম ও ক্রীড়া; কাগজের হাতের কাজ, অর্থাৎ কাগজ ভাঁজ করিয়া নানা জিনিষ তৈয়ারি।

তৃতীয় বৎসরের বিষয়—প্রথম দুই বৎসরেরই মত কিন্তু হাতের কাজ বদলাইয়া মাটির পুতুল ইত্যাদি গঠন এবং ইহার উপর বালিকাদের জন্য সেলাইয়ের কাজ।

চতুর্থ বৎসরে—তৃতীয় বৎসরের শিক্ষণীয় বিষয়গুলির সঙ্গে উদ্ভিদ্-বিদ্যা (Botany) এবং জীববিদ্যা (Zoology) যোগ করা হয়।

পঞ্চম বৎসরে—হাতের কাজ বদলাইয়া বালকদের জন্য ছুতারের কাজ এবং বালিকাদের সীবন-কার্য্যই চলিতে থাকে। পূর্ব্ব বৎসরের পঠনীয় বিষয়গুলির সঙ্গে জাপানের ভূপরিচয় এবং ইতিহাস যোগ করা হয়।

ষষ্ঠ বৎসরে—পূর্ব্ববৎসরের বিষয়গুলির সঙ্গে রসায়ন (Chemistry) এবং পদার্থবিদ্যা (Physics) যোগ করা হয় এবং জাপানের স্থলে পৃথিবীর ভূপরিচয় পাঠ্য হয়।

সাধারণতঃ সকাল আটটা হইতে বেলা দুইটা পর্য্যন্ত স্কুলের সময়। উপরোক্ত সকল বিষয়ের জন্যই সময় নির্দ্দিষ্ট থাকে। শনিবার ও রবিবারে ছুটি। সপ্তাহে প্রথম বিশ ঘণ্টা হইতে আরম্ভ করিয়া শেষে ত্রিশ ঘণ্টা পর্য্যন্ত কাজ হয়। দ্বিপ্রহরে মধ্যাহ্ন ভোজনের ছুটি হয়। বেলা বারটার সময় জাপানের সমস্ত লোক মধ্যাহ্ন ভোজনে



মন্দিরে শেয়ালের মূর্ত্তি। পুরোহিত ইহার গায়ে হাত দিয়া মন্ত্রপাঠ করিতেছে

পৃঃ ৩৯

বসে। প্রথম দুই-তিন বৎসর কোথাও কোথাও বালকবালিকারা একত্রে শিক্ষা পাইতে পারে। সাধারণতঃ বালকবালিকাদের শিক্ষালয় পৃথক। বিদ্যালয়ে শিক্ষা ব্যতীত সকল স্থলেই নিয়ম হইতেছে মাসের মধ্যে একবার প্রত্যেক শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদিগকে একত্রে ভ্রমণে বাহির হইতে হয় এবং বৎসরের মধ্যে এই ভ্রমণ একবার দূর দূর স্থানে সম্পাদিত হয় এবং আট-দশ দিনব্যাপী হয়। শিক্ষকগণ সঙ্গে গিয়া মিউজিয়াম্, মন্দির, স্মৃতিরক্ষার জন্য নির্মিত নানা দর্শনীয় স্থানের বিষয় বুঝাইয়া দেন। কোন একটি গন্ধক উস্রবণের স্থানে আমি দুই দিন ছিলাম। সেই সময় এক নিম্ন প্রাথমিক স্কুলের প্রায় দেড় শত ছাত্র আসিয়া এখানে চারি দিন কাটায়। তাহারা আহারের সময় সকলে একত্রে সারি দিয়া বসিয়া আহার করিত, শ্রেণীবদ্ধ হইয়া পতাকাহস্তে ভ্রমণে বাহির হইত এবং সন্ধ্যার পর গীত, আলোচনা, রচনা পাঠ এবং বক্তৃতা করিত। সমস্ত দিন আমি নিজের কাজে বাহিরে থাকিতাম, কাজেই ইহাদের কার্য্যাবলী প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ আমার হয় নাই।

এই উস্রবণ উয়েদা শহর হইতে প্রায় ছয় মাইল দূরে এক পল্লীতে অবস্থিত। হাজার লোক আসিলেও থাকিবার দেশীয় হোটেল আছে। মাঠের মধ্য দিয়া মাত্র কাঠের স্তম্ভ পুঁতিয়া বৈদ্যুতিক তার সহযোগে রেল ষ্টেশন হইতে ট্রাম আসিয়াছে। মোটর গাড়ী আসিবার রাস্তা আছে। আমি যখন ছিলাম তখন প্রায় চারি-পাঁচ শত লোক সেখানে ছিল। কিন্তু কোন গোলমাল নাই, কলহ-বচসা নাই। সকলেই নীরবে নিজের নিজের কাজ করিয়া যাইতেছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে জাপানে 'Common School' বলে।

প্রাথমিক শিক্ষা জাপানের প্রত্যেক বালকবালিকাকে দেওয়া হয় এবং বিনা বেতনে। উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব, প্রাণীতত্ত্ব এবং বিজ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষা কেবল মৌখিক বা পুঁথিগত নহে। প্রত্যেক স্কুলে ম্যাপ, চার্ট, মডেল্‌স্, মৃত জীবজন্তু এবং ইহাদের কঙ্কাল আছে এবং বিজ্ঞানশিক্ষার জন্য ল্যাবরেটরীও আছে।

এখন সহজেই বুঝা যাইবে, জাপানে প্রাথমিক শিক্ষা কত উচ্চ ধরণের। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠ শেষ করিয়াই কৃষি ও শিল্প বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হওয়া যায়। প্রাথমিক শিক্ষার পর মধ্য বিদ্যালয়ে (Middle Schools) পাঁচ বৎসর শিক্ষা, ইহা প্রায় আমাদের ম্যাট্রিকুলেশনের সমান। ইহারও মোটামুটি বিবরণ দেওয়া যাইতেছে। টেক্‌নিক্যাল স্কুলের বিষয় বলিবার সময় ইহার প্রয়োজন হইবে। শিক্ষণীয় বিষয় নীচে দেওয়া যাইতেছে। ইহাও উচ্চ ধরণের। বালক-দিগের জন্য—(১) নীতিশিক্ষা; (২) জাপানী ও চীনা ভাষার লিখন, পঠন, রচনা ও ব্যাকরণ (চীনা ভাষা হইতেই জাপানী ভাষার উৎপত্তি); (৩) ইংরেজী এবং ফরাসী কিম্বা জার্ম্মান ভাষা; (৪) গণিত; (৫) ইতিহাস ও ভূপরিচয় (জাপানী এবং পৃথিবীর) (৬) উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব; (৭) প্রাণীতত্ত্ব; (৮) রসায়নশাস্ত্র; (৯) পদার্থবিদ্যা, (১০) শারীরতত্ত্ব ও স্বাস্থ্যতত্ত্ব; (১১) কৃষি, (১২) ছুতার ও কামারের কাজ, (১৩) ব্যবসায় এবং হিসাব-রক্ষাপ্রণালী; (১৪) আইন (দেশের সাধারণ); (১৫) ইকনমিক্স (Economics বা অর্থশাস্ত্র); (১৬) ড্রইং এবং (১৭) ব্যায়াম, ড্রিল, অসিখেলা, মল্লযুদ্ধ, জুজুৎসু ও ক্রীড়া।

বালিকাদের জন্য—উপরের তালিকার তিন দফায় কেবল ইংরেজী কিম্বা ফরাসী ভাষা থাকে; এগার হইতে পনর দফা বাদ দেওয়া হয়; ষোল দফায় চিত্রাঙ্কণ যোগ করা হয়; সতের দফায় কেবল ব্যায়াম

ড্রিল ও ক্রীড়া থাকে ; এবং গার্হস্থ্য বিদ্যা ও কাপড় কাটা, ছাটা, সেলাই ও মেরামত যোগ করা হয়।

এই সকল শিক্ষার রীতিমত ব্যবস্থা আছে। কোন একটি বালিকা বিদ্যালয়ে এমন বিজ্ঞানাগার ও যন্ত্রপাতি দেখিয়াছি যাহা অন্ততঃ আমার সময় আমাদের প্রথম শ্রেণীর কলেজে ছিল না। প্রত্যেক স্কুলে বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলি শিক্ষা দিবার জন্য যথেষ্ট পরীক্ষাগার, ম্যাপ, মডেল, চার্ট, অস্থিকঙ্কাল, মৃত জীবের নমুনা আছে। কৃষি-মধ্যবিদ্যালয়ে খনিজতত্ত্ব শিক্ষার জন্য সকল রকম খনিজ দ্রব্যের নমুনা আছে। ইহা ছাড়া সকল স্কুলেই বিজ্ঞান অবলম্বনে আজ পর্য্যন্ত যে সকল সাধারণ ব্যবহার্য্য জিনিষ তৈয়ারি হইয়াছে, আধুনিক বিনাতারের টেলিফোন, টেলিগ্রাফ এবং রেডিও পর্য্যন্ত, সেই সকল বিষয় যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হয়। এই সকল যন্ত্রের সস্তা স্কুল-সেট তৈয়ারি করিয়া বিক্রীর জন্য বড় বড় কারখানা ও দোকান হইয়াছে।

মধ্যবিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করিয়াই বালকেরা ইঞ্জিনিয়ারিং আদি কলেজে ভর্ত্তি হইতে পায়। যাহারা উচ্চ শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইতে চাহে তাহারা আরও দুই বৎসর মধ্যবিদ্যালয়েরই উচ্চ শ্রেণীতে পাঠ করে। এই দুই শ্রেণীর নাম উচ্চ বিদ্যালয় বা High School.

যাহারা প্রাথমিক শিক্ষার পর মধ্যবিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হয় না তাহাদের জন্য দুই বৎসর পঠনোপযোগী উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ও আছে। সকল স্কুলের পক্ষেই ভ্রমণে বাহির হওয়া বাঁধা নিয়ম।

জাপানের উচ্চ শিক্ষার আলোচনা করা এখানে প্রয়োজন বোধ করি না। প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষণীয় বিষয়গুলি হইতে দেখা যায় যে, জাপানের প্রত্যেক নর-নারীর উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব, প্রাণীতত্ত্ব, রসায়নশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, ভূপরিচয় ও ইতিহাস সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা জন্মে।

আর আমাদের উচ্চ শিক্ষিতদেরও এই সকলের জ্ঞান প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিতও হয় না। সার্ব্বজনীন শিক্ষার দরুণ সকলেই জগতের গতি বুঝিতে পারে। ইহাতে কি উপকার হয় তাহার দুই একটি দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া যাইতেছে। জাপানের বহু রেশমকাটাই-কারখানাতে প্রায় পাঁচ লক্ষ লোক কাজ করে। ইহাদের মধ্যে প্রায় সাড়ে চারি লক্ষের উপর কৃষকশ্রেণীর বালিকা। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে সকল দ্রব্যেরই দাম প্রায় অর্দ্ধেক হইয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে রেশমসুতারও দাম পড়িয়া যায়। তখন কারখানাগুলিকে বাঁচাইবার জন্য এই সকল কারিগর স্বেচ্ছায় নিজেদের মজুরী শতকরা ত্রিশ টাকা কমাইয়া দেয়।

সার্ব্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার দরুণ কলকারখানা ইত্যাদি সকল কাজের কত সুবিধা ও উন্নতি হইয়াছে ও হইতেছে তাহা এককথায় বলা যায় না। কুলীমজুরেরা বুঝিয়া বুদ্ধির সহিত কাজ করিতেছে এবং বালকবালিকা যেই হউক, যেখানে দরকার যাহা লিখিবার প্রয়োজন লিখিয়া রাখিতেছে। এমন কি, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারগুলিতেও এই শ্রেণীর লোকই অঙ্ক দ্বারা যাহা নির্দ্ধারণ করা প্রয়োজন করিয়া লইতেছে এবং নোট রাখিতেছে। এই স্থলে জাপানে গণনা-যন্ত্রের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। এই যন্ত্রের জাপানী নাম 'সলোবান'। ইহা দ্বারা শ্লেট বা কাগজ পেন্সিলের সাহায্য ব্যতীত বড় বড় যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ অতি অল্প সময়ে করা যায়। এই কারণে রেশম, কৃষি এবং টেকনিক্যাল স্কুলেও এই যন্ত্র-সাহায্যে গণনা শিক্ষণীয় বিষয়। জাপানের সলোবানের বহুল প্রচলন। সর্ব্বত্রই লোকে ইহার সাহায্যে গণনা করে। জাপানী ভাষাতেই সমস্ত শিক্ষা দেওয়া হয়, উচ্চ শিক্ষা পর্য্যন্ত। আধুনিক সকল বিজ্ঞানের জন্যও জাপানী ভাষায় পুস্তক প্রণয়ন করা হইয়াছে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগগুলির জন্য সভাসমিতি



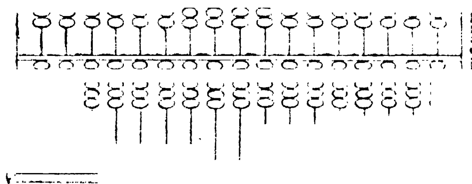
বালিকা স্কুলের ড্রিল পৃঃ ৪৫



তীর দ্বারা লক্ষ্যভেদ পৃঃ ৪৬

আছে এবং বৈজ্ঞানিক পত্রিকাদি জাপানী ভাষাতেই পরিচালনা করা হয়।

জাপানে শিক্ষার প্রথমাবস্থা হইতেই লক্ষ্য হইতেছে, প্রথম, জ্ঞানার্জ্জন দ্বারা মন গঠন, দ্বিতীয়, শরীর গঠন, তৃতীয়, জাতি গঠন এবং চতুর্থ, অর্থকরী বিদ্যালয়ের বহুল প্রচলন। পুস্তিকার শেষে প্রদত্ত শিক্ষায়তনগুলির সংখ্যা হইতে এই বিষয়ের মোটামুটি ধারণা জন্মিবে। সার্ব্বজনীন শিক্ষা এবং সকল বিষয়ের উচ্চ ধরণের শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া প্রত্যেক জাপানী নরনারীর মন গঠন কিরূপ হইতেছে তাঁহার



সলোবান

আভাস উপরে দেওয়া হইয়াছে। এখন শরীরগঠন ও জাতিগঠনের জন্য কি বন্দোবস্ত আছে সেই সম্বন্ধে কিছু বলা যাক্।

স্কুলের সংলগ্ন খেলার মাঠে ক্রীড়া ও ব্যায়াম শিক্ষণীয় বিষয়ের অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হয়। পঠনীয় বিষয়গুলির যেমন সময় নির্দ্ধারিত আছে ব্যায়ামের জন্যও সেইরূপ। বৃষ্টি বা বরফপাতের সময় বাহিরে ব্যায়ামের ব্যাঘাত হয় বলিয়া প্রত্যেক স্কুলে বৃহৎ ব্যায়াম-হল আছে। নির্দ্দিষ্ট সময়ে পৃথক শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীগণ এই হলে আসিয়া ব্যায়াম শিক্ষকের নির্দ্দেশানুসারে ব্যায়াম করে। এই ব্যায়াম অনেকটা সৈনিক বিভাগের ড্রিলের মত। একটি বালিকা স্কুলের ড্রিলের

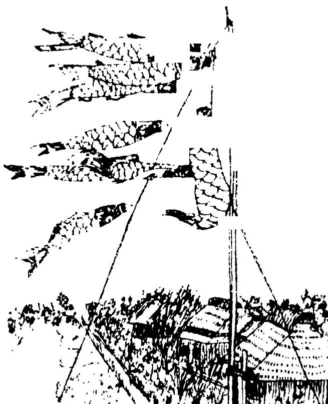
চিত্র দেওয়া গেল। এইরূপ নির্দ্দিষ্ট ব্যায়াম ছাড়া প্রত্যেক স্কুলে জুজুৎসু বা মল্লযুদ্ধ এবং ফেন্সিং বা অসি-ক্রীড়ার বন্দোবস্ত আছে এবং কোথাও কোথাও তীর ধনুক লইয়া লক্ষ্যভেদ প্রচলন আছে। জুজুৎসু আমাদের দেশের কুস্তি ছাড়া আর কিছু নয়। ইহার এক চিত্র দেওয়া হইল। অসি-ক্রীড়া জাপানের জাতীয় ক্রীড়া বলিলেই হয়। প্রকৃতপক্ষে অসি লইয়া এই ক্রীড়া হয় না। বাঁশের লাঠিকে লম্বালম্বি ফাড়িয়া ডগা বান্ধিয়া দেওয়া হয় এবং গোড়ায় হাতল লাগান হয়। ইহাই হইল অসি এবং ইহা দ্বারা আঘাত করিলে একটা শব্দ হয়। শরীরের কয়েক স্থানে আঘাত করিতে পারিলে বা না পারিলে হারজিত হয়। এই আঘাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মুখোস, দস্তানা ইত্যাদি যাহা ব্যবহৃত হয় সমস্তই চিত্র হইতে বুঝা যাইবে।

প্রত্যেক জাপানী বালককে দুই বৎসর সাধারণ সৈনিকদের সঙ্গে থাকিয়া যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিতে হয়। এই শিক্ষাও শরীরগঠনে বিশেষ সাহায্য করে। এখন অনেক স্কুলে বালকদিগকে সৈনিক বিভাগের মত ড্রিল ও বন্দুকাদি ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া হয় এবং এই শিক্ষায় পারদর্শিতা অনুসারে বাধ্যতামূলক যুদ্ধ শিক্ষার সময় কমান হয়।

নানাবিধ ক্রীড়ায় এখন জাপানী, বালক ও যুবকগণ বেশ কৃতিত্ব দেখাইতেছে। বেস্ বল খেলা এখন জাপানের জাতীয় খেলায় পরিণত হইয়াছে বলিলেই হয়। রাস্তায় মাঠে গলিতে প্রাঙ্গণে ছোট-বড় সকল বালকই এই খেলা করে। টেনিস্ খেলায় জাপানী খেলোয়াড়গণ জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। সন্তরণ, নৌকাচালন, বক্সিং বা ঘুসিখেলা, পর্ব্বতারোহণ, ফুটবল, ভলিবল, বাস্কেট্বল প্রভৃতি সকল প্রকার কায়িক শ্রমসাধ্য ক্রীড়াতেই জাপানীরা তাহাদের স্বভাবানুযায়ী

উৎসাহের সহিত লাগিয়া গিয়াছে। পৃথিবীব্যাপী ওলিম্পিক ক্রীড়া-ক্ষেত্রে জাপানীরা অনেক বিষয়েই কৃতিত্ব দেখাইতেছে।

শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনে জাতির কি আশা তাহা শিশু-উৎসবে বেশ প্রকাশ পায়। ৫ই মে তারিখ হইতেছে শিশু বালকদের উৎসব। ঐ দিনে যে বাড়ীতে শিশুপুত্র আছে জাপানের এইরূপ সমস্ত বাড়ীতে কাগজের বা কাপড়ের মাছের নিশান উড়ান হয়। আশা যে জলে মাছ যেমন বলবান ও তৎপর শিশু যেন সেইরূপ বলবান, কর্ম্মঠ ও সকল কার্য্যে চটপটে হয় এবং উত্তোলিত মৎস্যের ন্যায় উচ্চপদ



শিশুবালকদের উৎসব

প্রাপ্ত হয়। ৩রা মার্চ্চ তারিখ হইতেছে শিশুবালিকাদের উৎসবের দিন। ঐ দিনে বালিকারা পুতুল সাজায়। আশা যেন উত্তম বরে ও ঘরে বিবাহ হয়।

পাঠ্যতালিকায় যে moral training বা নীতিশিক্ষার ব্যবস্থা

আছে তাহার প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে দেশাত্মবোধ জাগরণ ও দৃঢ়ী-করণ। কৃষি, শিল্প প্রভৃতি সকল বিদ্যালয়েই ইহা বাধ্যতামূলক। প্রথম হইতেই সকল বালকবালিকার মনে স্বদেশ সম্বন্ধে উচ্চ আদর্শ গাঁথিয়া দেওয়া হয় যাহাতে তাহারা জাপানী বলিয়া গর্ব্ব অনুভব করে এবং জাতীয় আদর্শ বজায় রাখিতে যত্নবান হয়। এই আদর্শগুলির নাম 'নিপ্পন্ সিন্দো'। নিপ্পন্ সিন্দোর মোটামুটি আভাসের বেশী কিছু এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। সম্রাট্ মেজী নিজ অব্দের প্রথমেই জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে 'চকুঙ্গো' বা শিক্ষানুশাসন প্রচার করেন। এই অনুশাসন প্রত্যেক বালকবালিকাকে মুখস্থ করান হয় এবং বিশেষ বিশেষ উৎসবে আবৃত্তি করান হয়। ইহাই এখন নিপ্পন্ সিন্দোর ভিত্তিস্বরূপ। পণ্ডিত রেণানের মতে এক জাতীয়ত্বের মূলে হইতেছে এই জ্ঞান যে, জাতির সকলে একত্রে পূর্ব্বে বহু বড় কাজ করিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও করিতে সক্ষম ও ইচ্ছুক। ইহাই নিপ্পন্ সিন্দোর মূল নীতি। নিপ্পন্ সিন্দোর প্রথম শিক্ষা রাজভক্তি। সম্রাট দেববংশ-সম্ভূত এবং বংশানুক্রমে প্রায় ২,৬০০ বৎসর রাজত্ব করিয়া আসিতেছেন। জাপান কখনও কোন বিদেশী শত্রুর দ্বারা পরাভূত হয় নাই। পৃথিবীর অপর সকল দেশ হইতে জাপানের এই বিশিষ্টতা প্রত্যেক জাপানীর গৌরবের বিষয় এবং এই বিশিষ্টতা বজায় রাখিবার জন্য শিক্ষাদীক্ষা দ্বারা প্রস্তুত থাকা প্রত্যেক জাপানীর কর্ত্তব্য। জাপান ক্ষুদ্রদেশ এবং পৃথিবীর লোভী জাতি সকল হইতে আত্মরক্ষার জন্য প্রত্যেক জাপানীর যথাসাধ্য সচেষ্টতা প্রয়োজন। বলবান চীন ও রুষিয়াকে পরাস্ত করিয়া জাপান এখন পৃথিবীর প্রবলতম জাতিগুলির সমতুল্য হইয়াছে। গভীর রাজভক্তি এবং স্বদেশপ্রীতি দ্বারাই ইহা সম্ভব হইয়াছে। কোন জাপানী যেন এই উচ্চস্তর হইতে স্খলিত না হয়। জাতির বহুস্বার্থত্যাগী

এবং দেশ প্রভু ও সম্রাটের জন্য জীবনপাতকারী অসংখ্য বীরের দৃষ্টান্ত দ্বারা এই সকল ভাব প্রত্যেক বালকবালিকার মনে গাঁথিয়া দেওয়া হয়। সিন্দোর অপরাপর শিক্ষণীয় বিষয় হইতেছে পিতৃমাতৃভক্তি, পারিবারিক জীবনের বিশুদ্ধতা, স্বদেশী বিদেশী সকলের সহিত সৌভ্রাত্র, উচ্চচিন্তা ও উচ্চকার্য্য দ্বারা চরিত্রোন্নতি, নম্রতা, মিতব্যয়িতা সতত পরোপকার চেষ্টা ও শিক্ষা দ্বারা কার্য্যে সাফল্য, জ্ঞানার্জ্জন, নিয়মানুবর্ত্তিতা, সৎসাহস ইত্যাদি। জাপানীদের নিজেদের মধ্যে সৌভ্রাত্র শুধু আমাদের কেন অপরাপর বহু জাতির আদর্শ হওয়া উচিত। প্রকৃত শিক্ষা দ্বারাই ইহা সৃষ্ট হইয়াছে এবং বর্দ্ধিত হইতেছে। ইহাই জাপানীদের সহযোগে কাজ করিবার ক্ষমতা ও অভ্যাসের মূলে এবং সহযোগে কাজই সকল বিষয়ে জাপানীদের সাফল্যের মূলে। জাপানে দলাদলি, কলহবিবাদ নাই বলিলেই হয় এবং বিদেশেও কোন শ্রেণীর জাপানীর মধ্যে দলাদলি, কলহবিবাদ নাই। সর্ব্বত্রই জাপানীদের শান্তিপ্রিয়তার সুনাম আছে।

২। সমবায়

সার্ব্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার পরেই সমবায় নীতির কার্য্য। একত্রে সহযোগে ও সমবায়ে কাজ জাপানে যেরূপ ও যত হয় পৃথিবীর আর কোথাও বোধ হয় সেরূপ হয় না। সাধারণ জীবনের সকল বিষয়ে, ক্রয়বিক্রয়ে, শস্য উৎপাদনে, ছোট-বড় শিল্পে, ব্যবসাবাণিজ্যে, এমন কি, তীর্থযাত্রায় পর্য্যন্ত সমবায় সমিতি আছে। উৎকৃষ্ট সার্ব্বজনীন শিক্ষা সমবায়নীতি অবলম্বনপূর্ব্বক কার্য্যের সহায়ক হইয়াছে। যেখানে যেমন প্রয়োজন আইনকানুন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে যাহাতে সমবায়ে কার্য্যের সুবিধা হয়। সমিতিগুলির সংখ্যা কত তাহার

কিছু আভাস দিতেছি। জাপানে যত গ্রাম ও শহর আছে তাহাদের প্রত্যেকটিতে গড়পড়তায় সওয়াটি সমিতি আছে। একমাত্র সাইত্যমা জেলার অধিবাসীর সংখ্যা চৌদ্দ লক্ষের কম এবং গ্রাম ও শহরের সংখ্যা ৩৬৮। এই জেলায় সমিতির সংখ্যা ৫৩৩ এবং ইহা ছাড়া ব্যাঙ্ক ও এই সকল ব্যাঙ্কের শাখার সংখ্যা ১১৯।

প্রকৃতপক্ষে সহযোগে কাজ করিবার প্রবৃত্তি এবং ক্ষমতাই জাপানীদের দ্রুত উন্নতির প্রধান সহায়। প্রথম হইতেই বালকবালিকাদের ক্রীড়া, ব্যায়াম এবং ভ্রমণ দ্বারা সহযোগে সকলে মিলিয়া কাজ করিবার প্রবৃত্তি জাগাইয়া দেওয়া হয়।

৩। কৃষি ও শিল্প বিদ্যালয়

সমবায়নীতির পর কৃষিবিদ্যালয় ও শিল্পবিদ্যালয়ের (টেকনিক্যাল স্কুল) কার্য্য। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করিয়াই এই সকল স্কুলে ভর্ত্তি হওয়া যায়। কৃষিবিদ্যালয়ে এবং শিল্পবিদ্যালয়ে মধ্যবিদ্যালয়ের পাঠ্য অনেক যোজনা করা হইয়াছে। অতএব প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পর কৃষি বা শিল্পবিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইলেও সাধারণ জ্ঞানোন্নতির পথ একেবারে বন্ধ হয় না। মধ্যশ্রেণীর কৃষি ও শিল্পবিদ্যালয়ের উপর উচ্চশ্রেণীর কৃষি ও শিল্পবিদ্যালয় বা কলেজ আছে এবং প্রায় দুই বৎসর হইল ইঞ্জিনিয়ারিং বা টেকনিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। এই পুস্তিকায় এই সকল বিদ্যালয়ের বিশেষ বিবরণ দিবার স্থান নাই। ইহাদের সংখ্যা ও ছাত্রসংখ্যা পুস্তিকার শেষে দেওয়া হইয়াছে।

৪। পরীক্ষা ও গবেষণা

কৃষি ও শিল্পবিদ্যালয়ের সমতুল্য বা উচ্চতর স্থান হইতেছে

গবেষণা ও পরীক্ষাকেন্দ্রগুলি (Stations for Research and Experiment)। প্রত্যেক জেলায় পৃথক পৃথক কৃষি এবং রেশম পরীক্ষার কেন্দ্র আছে এবং যে জেলায় কোন শিল্প আছে সেখানে সেই শিল্পেরও পৃথক পরীক্ষা-কেন্দ্র আছে। এই সকল পরীক্ষা-কেন্দ্রে যত লোক কাজ করে তাহাদের সংখ্যা ধরিলে ইহাদের সকলগুলিই বাঙ্গালা দেশের বোধ হয় যাহা বৃহত্তম অনুষ্ঠান, অর্থাৎ ঢাকা কৃষিকেন্দ্রের, অপেক্ষা বড়। এই সকল জেলা-কেন্দ্র ছাড়া ইহাদের অপেক্ষা বড় জাতীয় গবেষণা ও পরীক্ষা-কেন্দ্র আছে। শিল্পসম্বন্ধে এখন দুইটি বিশ্ববিদ্যালয় (Technical বা Engineering University) খোলা হইয়াছে। এখানে গবেষণা ও পরীক্ষার কার্য্যই বেশী। টোকিও টেক্‌নিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত বিষয় হইতেছে :—(১) বয়ন-শিল্প ও বস্ত্ররঞ্জন শিল্প; এখানে কার্পাস ও উল সুতার কাজ হয়, রেশমের জন্য বহু উন্নত পৃথক স্থান আছে। (২) ফলিত রসায়ন শিল্প অর্থাৎ সাবান এসেন্স ইত্যাদি প্রস্তুত, (৩) মোজা, গেঞ্জি, ফিতা প্রভৃতি বুনন শিল্প, (৪) গৃহ ইমারতাদি নির্ম্মাণশিল্প (architecture), (৫) চীনামাটির বাসন প্রস্তুত (ceramics), (৬) ইলেকৃট্রিকাল ইঞ্জিরিয়ারিং, সাধারণ লোকের ব্যবহার্য্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি প্রস্তুত, (৭) Mechanical engineering, (৮) Applied mechanics, internal combustion engines, steam boilers, hydraulic engines, (৯) Electrical chemistry. জাপানের চারিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য, বিজ্ঞান, আইন প্রভৃতির ন্যায় কৃষির স্থান।

আজকাল গবেষণা ও পরীক্ষার যুগ। গবেষণা করিয়া নূতন জিনিষ ও প্রণালী উদ্ভাবন করা হয় এবং অপর কেহ নূতন জিনিষ বা প্রণালী উদ্ভাবন করিলে তাহা নিজেদের দেশ ও আবহাওয়ায় পরীক্ষা

করিয়া প্রয়োজনমত বদল করিয়া গ্রহণ করা হয়। যাহারা এই পন্থা অবলম্বন করে তাহারাই অগ্রগামী থাকিতে পারে এবং যাহারা না করে তাহারা সেকেলে হইয়া যায় এবং পশ্চাতে পড়িয়া থাকে। জাপান ইহা সম্যক অনুভব করিয়াছে এবং সকল বিষয়ে গবেষণা ও পরীক্ষার বন্দোবস্ত করিয়াছে। ফলে অনেক বিষয়ে এখন ইউরোপীয়দিগকেও পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রসর হইয়াছে। পাশ্চাত্য যন্ত্রপাতি, যেমন তাঁত, জাপানে পরীক্ষা করিয়া প্রয়োজনমত কাঠ লাগাইয়া এবং যতদূর সম্ভব সস্তা করিয়া দেওয়া হয় যাহাতে লোকে সহজেই এই সকল কিনিতে ও ব্যবহার করিতে পারে।

জাপান সাতচল্লিশটি জেলায় বিভক্ত। কেবলমাত্র রেশমশিল্পের জন্যই সর্ব্বজাপান প্রধান গবেষণা কেন্দ্রে বিশেষজ্ঞ একুশ জন, সহকারী বিশেষজ্ঞ পনের জন এবং সহকারী ছাপান্ন জন কাজ করেন। ইহা ছাড়া সাতচল্লিশটি জেলায় নানাস্থানে ছিয়াত্তরটি গবেষণা-কেন্দ্র আছে এবং এই সকলে একশ'বত্রিশ জন বিশেষজ্ঞ, দু-শ'যাট জন সহকারী বিশেষজ্ঞ, উনত্রিশ জন সহকারী এবং বাহাত্তর জন কেরাণী কাজ করিতেছে। এই ত হইল কেবল রেশম-কীট পালনের জন্য গবেষণা ও পরীক্ষার বন্দোবস্ত। ইহার উপর তুঁত চাষ, রেশম-কীট পালন, ডিম সরবরাহ, গুটী বিক্রয়, রোগ প্রভৃতি নিবারণ, এই সকল বিষয়ে সমবায় সমিতির তত্ত্বাবধারণ এবং রোগ নিবারণ, গুটী ক্রয়বিক্রয় ও সমিতি প্রভৃতির নিয়মাদি প্রতিপালিত হইতেছে কি-না দেখিবার জন্য তিনশ'তেষট্টিটি প্রতিষ্ঠান আছে এবং এই সকল প্রতিষ্ঠানে ছয়ষট্টি জন বিশেষজ্ঞ, সাতশ'সাতষট্টি জন সহকারী বিষেশজ্ঞ এবং দু-শ'চৌত্রিশ জন কেরাণী কার্য্য চালাইতেছে।

কৃষি গবেষণা, পরীক্ষা ও উন্নত প্রণালী প্রচলনের জন্যও রেশম-শিল্পের ন্যায় পৃথক পৃথক প্রতিষ্ঠান আছে।

৫। আধুনিক যন্ত্রপাতি

শিল্পে উন্নতির প্রধান উপায় হইতেছে আধুনিক যন্ত্রপাতি গ্রহণ। নূতন যন্ত্র পৃথিবীর যে-কোন স্থানেই উদ্ভাবিত হউক, জাপান প্রথমে তাহা আনাইয়া পরীক্ষা করে, গ্রহণের সুবিধার জন্য প্রয়োজনমত বদলাইয়া গ্রহণ করে এবং যতদূর সম্ভব সস্তা দরে তৈয়ার করিয়া সরবরাহের বন্দোবস্ত করে। সঙ্গে সঙ্গে টেকনিক্যাল স্কুলগুলিতে ইহার কার্য্য শিক্ষা দেওয়া হয়। নীচে রেশম-বয়নশিল্পের উদাহরণ দিয়া এই বিষয় বুঝাইবার চেষ্টা করিব। যে-লৌহনির্ম্মিত তাঁতের মূল্য ইউরোপ আমেরিকায় হয়ত পনের শত টাকা, জাপানে যতদূর সম্ভব কাঠ দিয়া তৈয়ারি সেইরূপ তাঁতের মূল্য হয়ত দুই শত টাকা। লৌহনির্ম্মিত তাঁতের মত ইহা টেঁকসই নয়; কিন্তু কাজ চলিয়া যাইতেছে এবং সকলেই ক্রয় করিতে পারে।

৬। বিজলীর ব্যবহার

শিল্পের এবং অনেক বিষয়ে কৃষির উন্নতির প্রধান সহায় হইয়াছে সস্তাদরে বিদ্যুত বা বিজলীর সরবরাহ। আমাদের দেশের তুলনায় জাপানের নদীগুলিকে খাল বলিলেই হয়। কিন্তু ইহাদের জলস্রোতের সাহায্যে বিজলী উৎপন্ন করিয়া দেশময় সস্তাদরে বিজলী সরবরাহ হইতেছে। পল্লীর কৃষকের গৃহ বিজলীর আলোকে আলোকিত, বিজলীর সাহায্যে ছোট ছোট যন্ত্রপাতি চলিতেছে, ঘরে ঘরে তাঁত চলিতেছে, এমন কি, টিনের কারিগর টিন ঝালাই

করিতেছে। বিজলীর সাহায্যে অনেক স্থানে রেল চলিতেছে এবং অনেক গ্রাম ও মাঠের ভিতর দিয়া ট্রাম চলিতেছে। সকল শিল্পেই বিজলীর ব্যবহারে কম পরিশ্রমে এবং কম সময়ে অতএব কম খরচে জিনিষ উৎপন্ন হইতেছে। জাপান যে সস্তা দরে জিনিষ বিক্রয় করে বিজলী সাহায্য হইল তাহার প্রধান উপায়। প্রথমে গবর্ণমেণ্টই এই বিজলী উৎপন্ন করিবার পথ দেখাইয়াছে। এখন বিজলী উৎপাদনকারী বহু কোম্পানী কাজ চালাইতেছে।

৭। ব্যাঙ্ক স্থাপন

ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়া অর্থপ্রাপ্তির সুগমতা সকল বিষয়ে উন্নতির সহায়। মানুষের শরীরে যেমন রক্ত, সমাজের ও দেশের সেইরূপ অর্থ। জাপানে সুদের হার সাধারণতঃ বৎসরে শতকরা বার টাকা হইলেও আমাদের দেশের মত কোথাও কোথাও উচ্চ হার এখনও আছে। সাধারণ কৃষি ও গৃহীদের মধ্যে সমবায় ঋণ সমিতি-গুলিই ঋণের বন্দোবস্ত করে। ইহাদের সুদের পরিমাণ বৎসরে সাধারণতঃ শতকরা দশ টাকা। শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্যের অর্থ সরবরাহ করে ব্যাঙ্কগুলি। বহু গ্রামে ব্যাঙ্ক বা ব্যাঙ্কের শাখা আছে। কৃষক ও শিল্পী রেশমগুটী বা অন্যান্য উৎপন্ন বিক্রয় করিয়া ব্যাঙ্কের চেক লইয়া যায় এবং হয় নিজের না-হয় নিকটবর্ত্তী গ্রামের ব্যাঙ্কে ভাঙ্গাইয়া লয়। মাত্র এক জেলাতে কত ব্যাঙ্ক আছে উপরে সমবায় নীতির উল্লেখে বলা হইয়াছে। আমাদের নিজেদের এক-আধটা ব্যাঙ্ক ফেল হইলেই হতাশ হইয়া নিজদিগকে ধিক্কার দিই। জাপানে প্রথম প্রথম বহু ব্যাঙ্ক নষ্ট হইয়াছিল। ব্যাঙ্কিং কার্য্য শিক্ষা করিয়া ব্যাঙ্ক স্থাপন আমাদের এখন নিতান্ত প্রয়োজন।

৮। গমনাগমনের সুবিধা

দেশের সর্ব্বত্র গমনাগমন ও আদান-প্রদানের সুবিধা। জাপান সর্ব্বত্র রেল বিস্তার করিয়াছে এবং পাহাড়ময় দেশে পাহাড় কাটিয়া রেল লইয়া যাইতে বহু ব্যয়ও করিয়াছে। ইহা ছাড়া দেশময় এমন রাস্তা করিয়াছে যে, ঘোড়ার গাড়ী, বাইসাইকেল ও মোটর গাড়ী যে-কোন গ্রামে যাইতে পারে। গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইবার জন্য এমন কি, বালিকা এবং বয়স্কা স্ত্রীলোকেরাও অনেকে বাইসাইকেল ব্যবহার করে। এইরূপ রাস্তা হওয়ায় মিলনের এবং ভাবের ও জিনিষের আদান-প্রদানের এবং ব্যবসার জন্য জিনিষপত্র লইয়া যাওয়া ও আনার সুবিধা হইয়াছে। গ্রামে কৃষকের বাড়ীতেও টেলিফোন ব্যবহৃত হইতে দেখিয়াছি। ইহাতে শীঘ্র কথাবার্ত্তা কহিয়া ভাবের এবং জিনিষপত্র আদান-প্রদানের সুবিধা হয়। এই উদ্দেশ্যে গ্রামে গ্রামে টেলিফোন স্থাপনের জন্য গবর্ণমেণ্ট সাহায্য করে। এইরূপ রাস্তা, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, রেল হওয়ার দরুণ দেশের যেখানে সুবিধা এমন কি, সুদূর পল্লীতেও বড় বড় কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। অনেক ছোট ছোট শহর গড়িয়া উঠিয়াছে। আমাদের যেমন থানা জাপানের সবডিবিজন বা মহকুমাও তত বড় নয়। কিন্তু জাপানের সবডিবিজনের সদর শহরগুলিও আমাদের বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ইত্যাদি শহর অপেক্ষা বহুগুণে শ্রীসম্পন্ন।

৯। উন্নতির দৃষ্টান্ত

পরীক্ষাকেন্দ্র, বিদ্যালয়, সমবায়নীতি, সস্তা বিজলী এবং গমনাগমনের সুবিধা প্রভৃতি কিরূপে উন্নতির সহায় হইয়াছে তাহার দুই-একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে।

সকল দেশেরই ন্যায় জাপানেও হাতের তাঁতেই কাপড় বুনা হইত। কমোডোর পেরীর আগমনের পর যখন বিদেশী বাণিজ্য আরম্ভ হইল তখনও এই অবস্থা। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ফুকুই জেলা হইতে ৬০,০০০ ইয়েনের রেশমী বস্ত্র বিদেশে চালান দেওয়া হয়। এই রেশমী বস্ত্রের মধ্যে 'হাবু-তাই' নামক বস্ত্রই প্রধান। ইহা আমাদের দেশের সাদা গরদের থানের মত জিনিষ। বিদেশে ইহার আদর বুঝিয়া তন্তুবায়েরা মিলিয়া এক সমবায় সমিতি গঠন করে। এই সমিতির মারফতে সমস্ত রেশমী বস্ত্র চালান দেওয়া হইতে লাগিল। সমিতি যে সকল দেশে এই বস্ত্রের কাটতি সেখানে লোক পাঠাইয়া তাহাদের চাহিদা কি জানিয়া সেই রূপ মাল তন্তুবায়দিগকে তৈয়ার করিতে উপদেশ দিতে লাগিল আর চালান দিবার পূর্ব্বে প্রত্যেকটি কাপড় পরীক্ষা করিয়া বস্ত্রগুলি এক মাপের কি-না, একই রকম মোটা সুতায় তৈয়ারি কি-না, টানা ও পড়েনে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক সুতা দিয়া বুনা হইয়াছে কি-না এবং কাটা ছেঁড়া ও দাগ আছে কি-না এই সকল দেখিয়া দিতে লাগিল। বিদেশের চাহিদা বুঝিয়া অন্যান্য রকম রেশমী বস্ত্রও তৈয়ার করিয়া চালান দিতে লাগিল। বিদেশে চালান যেমন বাড়িতে লাগিল সঙ্গে সঙ্গে এই জেলাতে গবর্ণমেণ্ট একটি পরীক্ষাগার এবং একটি টেকনিক্যাল স্কুল খুলিলেন। পরীক্ষাগারে ইউরোপ হইতে নানা রকম উন্নতধরণের তাঁত, রঙ করিবার যন্ত্র, কাপড়ে ছাপ দিবার যন্ত্র এবং কাপড় ধুইবার ও ইস্ত্রি করিবার যন্ত্র আনিয়া পরীক্ষা হইতে লাগিল। ফরাসী তন্তুবায় জেকার্ড এমন তাঁত প্রস্তুত করেন যে, তাহাতে যেমন ইচ্ছা সুতার হেরফের করিয়া চিত্রবিচিত্র বুননে কাপড় তৈয়ারি হয়। এই জেকার্ড তাঁতকে বদলাইয়া সস্তা করিবার উদ্দেশ্যে যতদূর সম্ভব কাঠ এবং অল্প পরিমাণ লোহা দিয়া তৈয়ারি করিয়া বিজলীর সাহায্যে



এক কৃষি-বিদ্যালয়ে জুদো বা জুজুৎসু পৃঃ ৭



স্কুলে অসিক্রীড়া বা ফেন্সিং শিক্ষা

এই তাঁত চালাইবার প্রণালী বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে 'বিজলী তাঁত' (power loom) সকলেই গ্রহণ করিল। এ জেলা হইতে হাতের তাঁত কয়েক বৎসর হইল উঠিয়া গিয়াছে। প্রত্যেক তন্তুবায়-গৃহে দুইটি তিনটি চারিটি বা আরও বেশী বিজলী তাঁত চলিতেছে। বিজলীর সাহায্যেই টানার সুতা সাজান হয় এবং নলিও ভরা হয়। অতএব বিজলী তাঁতে কাপড় বুনন গৃহশিল্পেরই মত চলিতেছে এবং কম পরিশ্রমে, কম সময়ে বেশী কাপড় বুনা হইতেছে। এই কারণেই জাপান সস্তায় বিদেশে এই সকল কাপড় বিক্রয় করিতে পারে। পরীক্ষাগারে নূতন প্রণালীতে যন্ত্রের সাহায্যে কাপড় ধোয়া ও ইস্ত্রি করার কার্য্য দেখিয়া লোকে কয়েকটি ধোলাই ও ইস্ত্রির কারখানা খুলে। তন্তুবায়েরা কাপড় বুনিয়া নিজেরা না ধুইয়া এই সকল কারখানায় ধোয়াইয়া ও ইস্ত্রি করাইয়া লইতে লাগিল। বিভিন্ন কারখানায় ধোলাই ও ইস্ত্রি বিভিন্ন রকম হইতে থাকায় নিয়ম করিয়া এখন ধোলাই ও ইস্ত্রির কারখানাগুলি এক করিয়া দেওয়া হইয়াছে, যাহাতে সব কাপড়ই একই রকমে ধোওয়া ও ইস্ত্রি হয়। এই সকল উন্নতির ফলে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে কেবল এক ফুকুই জেলার রপ্তানি রেশম বস্ত্রের মূল্য বাড়িয়া ১৭০,০০০,০০০ ইয়েন হয়। এই সকল উন্নতির উদ্দেশ্য হইতেছে সস্তায় প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদন এবং উৎপন্ন দ্রব্যের 'সমতাসাধন' (standardisation)। কোন জিনিষ পছন্দসই হইলে ক্রেতা পুনরায় যখন সেই জিনিষ ক্রয় করিতে যায় তখন যদি ঠিক সেই জিনিষটি পায় তাহা হইলে সে সন্তুষ্ট হয়। অতএব সমতাসাধন করিয়া যদি একইরূপ জিনিষ উৎপন্ন করিতে পারা যায় তাহা হইলে বাজারে এই জিনিষের আদর হয়। বিজলী সাহায্যে কলে প্রস্তুত হওয়ার দরুণ সস্তা দর ছাড়া সমতাসাধনই জাপানী এবং

বিলাতী রেশমী বস্ত্রের আদরের কারণ। আমি নানা দেশে ভারতীয় ব্যবসাদারদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি তাহারা ভারতে প্রস্তুত রেশমী বস্ত্র আমদানী ও বিক্রয় করে না কেন। উত্তরে সকলেই বলিয়াছে যে, এখন ভারতে প্রস্তুত রেশমী বস্ত্র একই নামের একখানি কাপড় আর একখানির সমান নয় এবং অসমান কাপড় বিক্রয় হয় না। ভারতের তন্তুবায়েরা শিল্পনৈপুণ্যে কম নয়। কিন্তু হাতে কাজ করিয়া বিজলীর সমকক্ষতা করিতে পারে না। উন্নত প্রণালী, উন্নত যন্ত্র এবং বিজলীর সাহায্য পাইলে আর বিদেশী বাজারের সহিত সম্পর্ক রাখিয়া চাহিদা বুঝিয়া জিনিষ উৎপন্ন করিতে পারিলে তাহারা পৃথিবীর সকল তন্তুবায়ের সহিত সমকক্ষতা করিতে সমর্থ। এই সকলের বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন।

এখানে এক জেলার বিবরণ দিলাম। আরও তিন চারি জেলার বয়নশিল্পের উন্নতির ইতিহাস একই রূপ। এই সকল স্থানেই পরীক্ষা-কেন্দ্র ছাড়া টেকনিক্যাল স্কুল আছে। কয়েকটি টেকনিক্যাল স্কুল দেখিয়াছি। একটিতে সাত শত বালক অধ্যয়ন করিতেছে। ইহাদের প্রায় সকলেই শিক্ষার পর নিজ নিজ বাড়ীতে ফিরিয়া কার্য্য করে এবং অতি অল্পই অন্যত্র চাকুরি লয়। রেশমকীট-পালন শিক্ষালয়গুলিতেও দেখিয়াছি কৃষকশ্রেণীর বালকগণ শিক্ষার পর সকলেই নিজ নিজ বাড়ীতে ফিরিয়া কার্য্য করে, অন্যত্র চাকুরি লয় না।

১০। এত আয়োজন সম্ভব হইল কিসে

জাপান এত ক্ষুদ্র দেশ হইলেও, প্রায় ষাট-সত্তর বৎসর পূর্ব্বে দরিদ্র থাকিলেও এত বিদ্যালয় এবং পরীক্ষাগার প্রভৃতির বন্দোবস্ত করিতে কিরূপে সমর্থ হইয়াছে? ইহার কারণ হইতেছে যে, বিশেষজ্ঞ ও

কার্য্যকারকদের বেতন অল্প। জাপানের প্রধান মন্ত্রীর বেতন মাসে মাত্র হাজার ইয়েন। জাপানের অপর মন্ত্রীদের এবং সরকারী চাকুরিয়াদের বেতনের পরিমাণ পুস্তকের শেষে দেওয়া গেল। প্রথম শ্রেণীর জেলার শাসনকর্ত্তার বেতন মাত্র পাঁচ শত ইয়েন। শাসন বিভাগের বেতন ছাড়িয়া দিয়া এখানে শিল্প-বিজ্ঞানবিভাগের বিশেষজ্ঞদের কথাই বলিব। ইঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করিয়া কার্য্য আরম্ভ করেন মাসিক পঁচাত্তর ইয়েন বেতনে এবং কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবার সময় সর্ব্বোচ্চ বেতন হয় মাসিক প্রায় তিনশত পচাত্তর ইয়েন। রেশম বিভাগের সর্ব্বপ্রধান জাতীয় গবেষণা ও পরীক্ষা-কেন্দ্রের সর্ব্বোচ্চ বিশেষজ্ঞদের এবং কৃষি বিভাগের ও এইরূপ কেন্দ্রের কয়েকজন বিশেষজ্ঞের সহিত আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুবিধা হইয়াছিল। কার্য্যে প্রবেশের পর গবর্ণমেণ্টের আদেশে এবং খরচে ইঁহারা ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মানী ও আমেরিকা হইতে ডি. এস্-সি., পি. এইচ্-ডি প্রভৃতি উপাধি লইয়া আসিয়াছেন। এখন বেতন পান কেহ আড়াইশত কেহ তিনশত ইয়েন। ইঁহাদের কার্য্যের ফলেই রেশম ও কৃষির এত উন্নতি হইয়াছে। ইঁহাদের প্রায় কাহারও বাড়ীতে চাকরাণী পর্য্যন্ত নাই। স্ত্রী ও কন্যারা গৃহস্থালীর সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করেন এবং কন্যারা স্কুল কলেজে অধ্যয়নও করেন। আমেরিকাতেও বিশেষজ্ঞেরা একশত ডলারে কার্য্য আরম্ভ করেন। জার্ম্মানী, ফ্রান্স এবং ইতালীতেও প্রায় এইরূপ। ইংলণ্ডের সহিতই আমাদের সম্পর্ক এবং ইংলণ্ড হইতেই আমাদের বিশেষজ্ঞরা আহরিত হয়। ইংলণ্ডে বৎসরে দেড়শত বা দুইশত পাউণ্ড বা আমাদের টাকার হিসাবে মাসে প্রায় দুইশত টাকা বেতনে কার্য্য আরম্ভ করিতে পারিলে বিশেষজ্ঞেরা কৃতার্থ হয়। কিন্তু আমাদের দেশে এই শ্রেণীর

কিম্বা ইহাদের অপেক্ষা নিম্ন শ্রেণীর বিশেষজ্ঞেরা আসিয়াই কার্য্য আরম্ভ করে প্রায় মাসিক পাঁচশত টাকায় এবং বেতন ছাড়া ভাতা বাবদে আরও দুই তিন শত টাকা পায়। তার উপর আমাদের দেশে যত বেশী এবং যত লম্বা লম্বা ছুটি এমন আর কোথাও নাই। খাস বিলাতেই বড়দিনে মাত্র একদিন এবং নূতন বৎসরের প্রথম দিন একদিন ছুটি হয়। ইহার স্থলে আমাদের দেশে হয় কমপক্ষে নয় দিন। এই হারে অন্যান্য ছুটিরও বন্দোবস্ত। তার পর বিলাতী বিশেষজ্ঞেরা গড়ে চারি বৎসর অন্তর আটমাস বা এক বৎসরের লম্বা ছুটি লইয়া দেশে যান এবং এই ছুটিতে যাওয়া-আসার খরচ আমাদিগকেই বহন করিতে হয়। এই বেতন-ব্যয়বাহুল্যের জন্যই আমাদের দেশে কাজ অল্প হইতেছে। উচ্চ বেতন জোগাইবার চিন্তায় নূতন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারা যায়না। বিলাতী বিশেষজ্ঞদিগকে উচ্চ বেতনে আনা হয়। আমাদের দেশীয়েরাও এইরূপ কার্য্যে নিযুক্ত হইলে তাঁহারাও তদ্রূপ উচ্চ বেতন দাবী করেন এবং পাইয়াও থাকেন। ফলে আমাদের বিচার, শাসন ও সৈনিক বিভাগ চালাইবার বরাদ্দ বাদে দেশের ধনোৎপাদক কোন কার্য্যের জন্য টাকা অবশিষ্ট থাকে না।

এই উচ্চ বেতনের হার আমাদের ক্ষুদ্রবৃহৎ সকল শিল্পপ্রতিষ্ঠানের অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ জামসেদপুরের টাটা কোম্পানীর কথা বলিতেছি। যে শিল্পী ইউরোপ আমেরিকায় দুই-তিনশত টাকায় কাজ করিত তাহাদিগকে আনিয়া টাটা কোম্পানীতে বার-তেরশত টাকা বেতনে নিযুক্ত করা হইয়াছে। ফলে হইয়াছে কি? এখানে প্রস্তুত লোহা বিদেশী লোহার সহিত আমাদেরই দেশে প্রতিযোগিতা করিতে পারিতেছে না। ব্রহ্মদেশে কেরোসিন ও পেট্রোল উৎপন্ন হয়। খনি হইতে এই কেরোসিন উত্তলন-যন্ত্র চালাইবার

জন্য আমেরিকা হইতে মাসিক আঠার শত বেতনে ড্রিলার আনা হয়। ফলে ব্রহ্মদেশেরই মান্দালয় শহরে যেদিন এই কথা লিখিতেছি সেই দিনে পেট্রোলের দাম প্রতি গ্যালন ১।৴ এবং লণ্ডনে প্রায় মাত্র বার আনা এবং কিছু দিন পূর্ব্বে নয় আনা ছিল। বিদেশ হইতে উচ্চ বেতনে বিশেষজ্ঞ আনিয়া শিল্পপ্রতিষ্ঠান চালাইবার অর্থ মানে এখন দাঁড়াইয়াছে দেশের অর্থ অযথা বেশী ব্যয় করা। দেশী শিল্পের নামে বিদেশে আরও বেশী অর্থ চালান দেওয়া।

এই বিষয় লোকের, আইন-সভার সভ্যদের এবং মন্ত্রীদের বিশেষ করিয়া চিন্তা করা প্রয়োজন। ইহার প্রতিকার হইতেছে ক্রমেই বিদেশী বিশেষজ্ঞ আমদানী বন্ধ করা এবং দেশী লোকের শাসন, বিচার ও বৈজ্ঞানিক সকল বিভাগেই বেতন কমাইয়া যথাসম্ভব এক করিয়া দেওয়া। এখন সকল মেধাবী ছাত্রই ডেপুটিগিরির দিকেই হা করিয়া তাকাইয়া থাকে। উচ্চ বেতনের সমস্ত চাকুরিই প্রায় সাহেবদিগের একচেটিয়া। যাঁহারা এখন আছেন তাঁহাদিগের পর যাঁহারা বহাল হইবেন তাঁহাদের সকলের বেতন কমাইয়া দিতে হইবে এবং যেখানে সম্ভব দেশী লোক নিযুক্ত করিতে হইবে। আর এই বেতন কম করার দরুণ যে টাকা বাঁচিবে তাহা দ্বারা একের স্থানে দুই জন তিন জন নিযুক্ত হইতে পারিবে এবং শিল্প-প্রতিষ্ঠানাদির গঠনে সাহায্য হইবে। এখন যে ভাগ্যবান ব্যক্তি ইম্পিরিয়াল সার্বিসে চাকুরি পাইলেন তিনি পাইবেন হয়ত পনের শত এবং তাঁহারই সহপাঠী ও সমকক্ষ ব্যক্তি হয়ত শিক্ষকরূপে পাইবেন দুই শত।

যে সকল সাহেব উচ্চ বেতনে আসেন নিজেদের দেশে তাঁহারা এরূপ নবাবী করেন না। এখানে এত টাকা পান বলিয়াই করেন। বিভাগীয় কমিশনারকে মাত্র একটি চাকরাণী লইয়া কেবল দু-তিনটি

কামরা ভাড়া করিয়া বিলাতে থাকিতে দেখিয়াছি। এখানকার মত রাজপ্রাসাদ তুল্য বাড়ীও নাই আর দশ-বারটা দাসদাসীও নাই। আর আমাদের দেশীয়দিগকেও এইরূপ উচ্চহারে বেতন দিয়া তাহাদের বৃথা বিলাসিতা বাড়াইয়া দিই। ইহাতে দেশের সর্ব্বনাশ হইতেছে। আমাদের মধ্যে যাঁহারা ভাগ্যক্রমে এইরূপ উচ্চ বেতনের চাকুরি পান তাঁহারা নিজদিগকে এক বিশিষ্ট নূতন জীব বলিয়া মনে করেন এবং সাধারণ লোকের সহিত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করেন। ফলে ইঁহাদের নিকট হইতে দেশ বা সমাজ কিছুই পায় না বলিলেই হয়। এইরূপ দেশী প্রভুরা কোন কোন বিষয়ে বিলাতী প্রভুদিগকেও ছাড়াইয়া যান।

জাপানে সরকারী চাকুরিতে বেতন কম এবং এই কারণে ব্যবসা ও অপরাপর সকল প্রতিষ্ঠানেই বেতন কম। কিন্তু শ্রমিক পুরুষ ও স্ত্রীলোক বা বালিকাদের বেতন ইংলণ্ডের তুলনায় কম হইলেও আমাদের দেশের তুলনায় বেশী। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে পুরুষদের গড়ে দৈনিক বেতন ছিল প্রায় আড়াই ইয়েন এবং স্ত্রীলোকদের প্রায় এক ইয়েন। রেশম কাটাই ও বস্ত্রবয়ন কারখানায় বালিকারা খাইতে ও থাকিতে পায় এবং গড়ে দৈনিক ¾ ইয়েন বেতন পায়। জাপানে ছোট-বড় সকল কারখানাতেই কর্ম্মীদিগকে থাকিতে ও খাইতে দিবার নিয়ম। কৃষক বালিকাদিগকে বহু কারখানায় এমন পোষাক ও জুতা পরিয়া কাজ করিতে দেখিয়াছি যাহা আমাদের চাকুরিয়াদেরও জোটে না।

জাপানে ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর দেখিতে পাওয়া যায় না এবং অপরদিকে দারিদ্র্যের পীড়ন নাই। এখন জাপান পৃথিবীর মধ্যে একটি সুখী ও সমৃদ্ধিশালী দেশ।

পরিশিষ্ট ক

জাপানী গবর্ণমেণ্ট ও গবর্ণমেণ্টের চাকুরি

সম্রাট মাৎসুহিতো কয়েকজন বিজ্ঞ ব্যক্তিকে, বিশেষ করিয়া প্রিন্স ইতোকে, পাশ্চাত্য দেশগুলির গবর্ণমেণ্টের গঠন পরীক্ষা করিয়া জাপানের আধুনিক গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী নূতন বিধিব্যবস্থা প্রণীত হইয়াছে। নীচে ইহার মোটামুটি বিবরণ দেওয়া যাইতেছে—

প্রথম স্থান হইতেছে সম্রাট বা মিকাডোর। তিনি মন্ত্রীদের পরামর্শে গবর্ণমেণ্ট চালান। কিন্তু তিনি দেববংশসম্ভূত এবং সমগ্র জাতির কর্ত্তা এই বিশ্বাস এখনও বর্ত্তমান।

সম্রাটের পরেই প্রিভি কাউন্সিল। ইহার সভ্য ছাব্বিশ জন। বিজ্ঞতা, বয়োধিক্য এবং দেশের জন্য ইহাদের কার্য্য দেখিয়া ইহারা নির্ব্বাচিত হন। এই সভার কার্য্য মাত্র সম্রাটকে পরামর্শ দেওয়া। প্রধান মন্ত্রীর অনুরোধে সম্রাট প্রিভি কাউন্সিলের পরামর্শ চাহিলে ইহারা পরামর্শ দেন। নিজেরাই উপযাচক হইয়া পরামর্শ দিবার ক্ষমতা ইহাদের নাই।

ক্যাবিনেট্ বা মন্ত্রীসভা মন্ত্রিগণ লইয়া গঠিত। ক্যাবিনেট্ই দেশের কার্য্য পরিচালনা করেন।

জাপানের পার্লিয়ামেণ্টের নাম ডায়েট্। ডায়েটের আবার দুই ভাগ। (১) পিয়ারদিগের সভা, বিলাতের যেমন লর্ড সভা বা

ভারতবর্ষের যেমন কাউন্সিল অব্ ষ্টেট্। এই সভার সভ্য হইতেছে রাজবংশের লোক, প্রিন্স এবং মার্কুইস্‌গণ, কাউন্ট, ভাইকাউন্ট এবং ব্যারণদিগের প্রতিনিধি, যাঁহারা খুব উচ্চ কর দেন তাঁহাদের প্রতিনিধি এবং সম্রাট কর্ত্তৃক মনোনীত দেশের বিশিষ্ট লোক। (২) সাধারণ সভা—সাধারণ লোকদিগের ভোট দ্বারা নির্ব্বাচিত সভ্যগণ দ্বারা ইহা গঠিত। ইংলণ্ডের কমন্স সভা বা আমাদের লেজিস্‌লেটিভ্ এসেম্‌ব্লীর সহিত ইহা তুলনীয়।

ইহা ব্যতীত নব্য জাপান যাঁহারা গড়িয়া তুলেন সেই বিজ্ঞ রাজপুরুষ বা 'জেন্‌রো'দের এক সভা ছিল। সকল কার্য্যেই ইঁহাদের পরামর্শ গ্রহণ করা হইত। এখন ইঁহাদের মধ্যে মাত্র একজন, প্রিন্স সিয়োন্‌জি, জীবিত আছেন। তিনি অতি বৃদ্ধ হইয়াছেন, কিন্তু সকল বিষয়েই তাঁহার পরামর্শ এখনও গ্রহণ করা হয়।

ইংলণ্ডের মন্ত্রীসভা হইতে জাপানের মন্ত্রীসভার পার্থক্য এই হইতেছে যে, মন্ত্রিগণ ডায়েটের সাধারণ সভায় ভোটে হারিলেও পদত্যাগ করিতে বাধ্য নহেন।

সমস্ত জাপান সাতচল্লিশটি প্রিফেক্‌চর্ বা প্রদেশে বিভক্ত। এইগুলি আমাদের জেলার ন্যায়, কিন্তু সাধারণতঃ ইহাদিগকে প্রদেশ বলা হয় এবং ইহাদের শাসনকর্ত্তাদিগকে ম্যাজিষ্ট্রেট্ না বলিয়া গবর্ণর বলা হয়। টোকিও প্রদেশের অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় পঁয়তাল্লিশ লক্ষ, ওসাকার একত্রিশ লক্ষ, অপর চারিটির বিশ লক্ষের উপর, বাইশটির দশ লক্ষের উপর, অপরগুলির ছয় লক্ষ হইতে দশ লক্ষের ভিতর। আমাদের যেমন ভারত গবর্ণমেণ্ট বা ইম্পিরিয়াল গবর্ণমেণ্ট, সমস্ত জাপানের জন্য সেইরূপ ইম্পিরিয়াল বা ন্যাশন্যাল বা জাতীয় গবর্ণমেণ্ট আছে। কৃষি, রেশম প্রভৃতি বিভাগের জন্য এই জাতীয় গবর্ণমেণ্টের অধীন ব্যুরো

আছে। এই সকল ব্যুরোর অধীনে প্রদেশগুলির সকল বিভাগ পরিচালিত হয়। প্রদেশগুলিতে পৃথক আইন সভা নাই।

সরকারী কার্য্যে এবং সৈনিক ও নৌযুদ্ধ বিভাগে নিযুক্ত লোক চারিবর্গে বিভক্ত। প্রথম বর্গ বা 'শিন্-নিন্'—ইহাতে পড়েন মন্ত্রিগণ, বিদেশে নিযুক্ত রাজদূতগণ প্রভৃতি। সম্রাট স্বয়ং ইঁহাদিগকে নিযুক্ত করেন এবং ইঁহারা সম্রাটের সহিত চিঠিপত্র ও কথাবার্ত্তা আদান-প্রদান করিতে পারেন।

দ্বিতীয় বর্গ বা 'চকু-নিন্'—ইহাতে পড়েন অধস্তন মন্ত্রিগণ, ব্যুরোর ডাইরেক্টরগণ, প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাগণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ কোন কোন অধ্যাপক প্রভৃতি। মন্ত্রিগণের পরামর্শে সম্রাট কর্তৃক ইঁহারা নিযুক্ত হন এবং ইঁহারা রাজদরবারে উপস্থিত হইতে পারেন। কর্ম্মচারীর সংখ্যা চাকুরিতে ১২৬৩ এবং নাবিক ও নৌযুদ্ধ বিভাগে ৩৩০।

তৃতীয় বর্গ বা সো-নিন্—দপ্তরখানার সেক্রেটারীগণ, কৃষি, রেশম, বিজ্ঞান বিভাগের বিশেষজ্ঞগণ, অধ্যাপকগণ প্রভৃতি। ইঁহারা রাজদরবারে উপস্থিত হইতে পারেন না। কর্ম্মচারীর সংখ্যা চাকুরিতে ১৩,৬৭০ এবং সৈনিক ও নৌযুদ্ধ বিভাগে ১৭,২৭২।

চতুর্থ বর্গ বা হান্-নিন্—কেরাণীগণ, সহকারী ইঞ্জিনিয়ারগণ প্রভৃতি। কর্ম্মচারীর সংখ্যা চাকুরিতে ২,১৫,৯৫৩ এবং সৈনিক ও নৌযুদ্ধ বিভাগে ৯৮,৩৭৯।

উপরি-উক্ত কর্ম্মচারীদের বেতনের পরিমাণ নিম্নে দেওয়া যাইতেছে। জাপানের মুদ্রার নাম ইয়েন্। আমাদের টাকার সহিত ইহার বিনিময় করিতে হইলে সর্ব্বোচ্চ হার এক ইয়েনে এক টাকা নয় আনা। বিনিময়ের পরিমাণ সব সময় ঠিক থাকে না, কখনও কখনও নামিয়া

এক টাকা চারি আনা পর্য্যন্ত হয়। বিনিময় করিতে হইলেই ইয়েন ও টাকার মূল্যের তারতম্য হয়। তাহা না হইলে আমাদের দেশে যেমন টাকা জাপানে ইয়েনও সেইরূপ টাকা। আমেরিকার ডলারও সেইরূপ তাহাদের টাকা, যদিও বিনিময়ে ডলারের দাম আমাদের টাকার আড়াই হইতে তিন টাকা। এই কারণে আমাদের দেশে মাসিক একশত টাকা বেতনও যা, জাপানে একশত ইয়েনও তাই। নিম্নে বেতনের পরিমাণ ইয়েনেই দেওয়া গেল। বেতন বাৎসরিক হিসাবে গণনা করা হইলেও মাসিক হিসাবেই দেওয়া হইল।

প্রথম বর্গ

পদ	মাসিক বেতন
প্রধান মন্ত্রী	১০০০ ইয়েন
অপর মন্ত্রিগণ এবং কোরিয়ার গবর্ণর-জেনারেল	৬৬৬
প্রিভি-কাউন্সিলের প্রেসিডেণ্ট, ক্যান্টাঙের শাসনকর্ত্তা, ফর্ম্মোশার শাসনকর্ত্তা, রাজদূতগণ (ambassadors) প্রধান বিচারপতি, হিসাব-পরীক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ, প্রধান বিচারালয়ের প্রধান আইনজ্ঞ (Procurator-General), প্রিভি-কাউন্সিলের সহকারী প্রেসিডেণ্ট, কোরিয়ার শাসনবিভাগের অধ্যক্ষ	৬২৫ ইয়েন
প্রিভি-কাউন্সিলারগণ	৫৪২ ,,

দ্বিতীয় বর্গ

ইম্পিরিয়াল ইউনিভার্সিটির অধ্যক্ষ, লোহার কারখানার অধ্যক্ষ এবং হোকাইদো প্রদেশের শাসনকর্ত্তা	৫৪২ হইতে ৬২৫ ইয়েন
মন্ত্রি-সভার প্রধান সেক্রেটারী, আইন-সভার অধ্যক্ষ, সহকারী মন্ত্রিগণ, রাজধানীর পুলিসের অধ্যক্ষ প্রভৃতি	৫৪২ ,,
সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিগণ	৩৭৫ হইতে ৫৪২ ,,
কারাফুতো এবং দক্ষিণ সমুদ্রের ম্যাণ্ডেটপ্রাপ্ত দ্বীপপুঞ্জের শাসনকর্ত্তা এবং প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাগণ	৪৩৫ হইতে ৫০০ ,,
কৃষি ব্যুরো, রেশম ব্যুরো প্রভৃতি ব্যুরোর অধ্যক্ষগণ	৪৩৫ ,,
প্রিভি-কাউন্সিলের প্রধান সেক্রেটারী	৪৭৫ ,,
আইন-সভার প্রধান সেক্রেটারী	৪৩৫ হইতে ৪৭৫ ,,

তৃতীয় ও চতুর্থ বর্গ

	তৃতীয় বর্গ মাসিক বেতন	চতুর্থ বর্গ মাসিক বেতন
১ম শ্রেণী	৩৭৫	১৬০
২য় ,,	৩৪১	১৩৫
৩য় ,,	৩১৬	১১৫
৪র্থ ,,	২৮৩	১০০
৫ম ,,	২৫৮	৮৫
৬ষ্ঠ ,,	২২৫	৭৫
৭ম ,,	২০০	৬৫
৮ম ,,	১৬৬	৫৫
৯ম ,,	১৫০	৫০

	মাসিক বেতন	মাসিক বেতন
১০ম ,,	১৩৩	৪৫
১১শ ,,	১১৬	৪০
১২শ ,,	১০০	—

বিচার বিভাগ

সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং প্রধান আইনজ্ঞ (Procurator-General)	৬২৫
বিচারপতিগণ ও আইনজ্ঞগণ (Procurators)	৩৭৫ হইতে ৫৪২
আপিল কোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং প্রধান আইনজ্ঞগণ	৪৩৫ হইতে ৫৪২
বিচারপতিগণ	৩৭৫ হইতে ৪৩৫
প্রাদেশিক বা জেলার জজগণ	৩৭৫ হইতে ৪৩৫

সৈনিক বিভাগ ও নৌ-বিভাগ

সৈনিক-বিভাগ	নৌ-বিভাগ	মাসিক বেতন
জেনারেল্	য়্যাড্‌মিরাল্	৬২৫
লেফ্‌টেনাণ্ট্‌-জেনারেল্	ভাইস্-য়্যাড্‌মিরাল্	৫৩২
মেজর জেনারেল্	রিয়ার য়্যাড্‌মিরাল্	৪৬৬
কর্ণেল্	ক্যাপ্টেন্	৩৮৪
লেফটেনাণ্ট-কর্ণেল্	কমাণ্ডার	৩০০
মেজর	লেফটেনাণ্ট কমাণ্ডার	২১৬
ক্যাপ্টেন	লেফটেনাণ্ট	১৩৩ হইতে ১৭৫
লেফটেনাণ্ট	সব-লেফটেনাণ্ট	৮৫ হইতে ১০০

সমস্ত চাকুরির বিবরণ দেওয়ার আবশ্যক নাই। ১৯২০ সনের পূর্ব্বে বেতন ইহাপেক্ষাও কম ছিল। আবার ১৯৩১ সনে পৃথিবীব্যাপী অর্থানটনের দরুণ শতকরা বিশ পর্য্যন্ত বেতন কমিয়া গিয়াছে। পনর বৎসর চাকুরির পর বেতনের তিন-ভাগের এক-ভাগ পেন্সন দেওয়া হয় এবং পনর বৎসরের উপর চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত প্রত্যেক বৎসর চাকুরির জন্য বেতনের ১/১৫০ অংশ পেন্সনে যোগ করা হয়।

জাপানের আয়-ব্যয়

ইম্পিরিয়াল্ গবর্ণমেণ্ট (১৯৩০—৩১ সন)

আয়—১,৬০,৮৬,৩৮,০০০

ব্যয়—ঐ

এই ব্যয়ের মধ্যে—

যুদ্ধ-বিভাগের জন্য—২০,০৭,৮৬,০০০

নৌযুদ্ধ ,, ,, ২৬,২৮,৩৬,০০০

শিক্ষা ,, ,, ১১,৪১,২০,০০০

জাতীয় ঋণের পরিমাণ—৫,৯৫,৯৪,৫৭,০০০

জনপ্রতি—৬৬

প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলির আয়—	১,৭৬,০৭,৭২,০০০
খরচের মধ্যে পুলিশের জন্য	৮,১১,৫০,০০০
পূর্ত্ত বিভাগ জন্য	২৪,২৯,২২,০০০
শিক্ষার জন্য	৪৪,২৬,৪৮,০০০
শ্রমশিল্পের জন্য	৮,১৪,৫৩,০০০
স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য	১২,০৯,৫৮,০০০
সমাজের নানাবিধ কার্য্যের জন্য	১,৭৪,১১,০০০

১৯২৮—২৯ সনের গণনানুসারে জাপানে জনপ্রতি

আয়ের পরিমাণ	২২৪
জনপ্রতি ট্যাক্সের পরিমাণ	২৬

পরিশিষ্ট খ

জাপানের বর্ত্তমান শিক্ষায়তন

১৯২৮ সনের সংখ্যা

বিবরণ	সংখ্যা	শিক্ষক-সংখ্যা	ছাত্রছাত্রী-সংখ্যা
কিণ্ডার গার্টেন ৩ হইতে ৭ বৎসর বয়স্ক বালকবালিকার জন্য (এই শিক্ষা বাধ্যতামূলক নহে)	১,০৮২	৩,৫৯৩	৯৯,৩৭৪
প্রাথমিক স্কুল (Common Schools) এই শিক্ষা বাধ্যতামূলক প্রত্যেক ১০০ বালকবালিকার মধ্যে ৯৯½ জন শিক্ষা পাইতেছে।			
সরকারী	২৫,৪৪২	২,২৪,৮২২	৯৪,৬৭,১৬০
বে-সরকারী	১০৪	৪৭০	২৮,৮১৭
মোট	২৫,৫৪৬	২,২৫,২৯২	৯৪,৯৫,৯৭৭
নর্ম্ম্যাল স্কুল—প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক তৈয়ারির জন্য,			
সরকারী	১০২	২,৭৮৪	৪৯,৩৯৪
উচ্চতর নর্ম্ম্যাল স্কুল, মধ্য নর্ম্ম্যাল, ও বালিকাদিগের উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক তৈয়ারির জন্য,			
সরকারী	২	১৯৯	১,৩৮৮

	সংখ্যা	শিক্ষক-সংখ্যা	ছাত্রছাত্রী-সংখ্যা
ঐ বালিকাদিগের জন্য—সরকারী	২	১১৬	৮৪৭
এই কার্য্যের জন্য টিচারস্ ইনিষ্টিটিউট সরকারী	১৫	৪৩৬	১,২০৯
	১৩১	৩,৫৩৫	৫৪,২৮৮
মধ্য বিদ্যালয়—			
সরকারী	৪১৪	১০,৭১৫	২,৬৮,০৫৮
বে-সরকারী	১০৬	২,৫৭৫	৬১,১৯৩
উচ্চ বিদ্যালয় (High Schools) মধ্য বিদ্যালয়ে পাঠ শেষ করিয়া যে সকল বালক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইতে চায় তাহাদের জন্য			
সরকারী	৫৪	১,১০৭	১৬,৬৮৮
বে-সরকারী	৭	১১৫	৬২৪
বালিকাদিগের জন্য উচ্চবিদ্যালয় ইহাতে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালনোপযোগী শিক্ষা দেওয়া হয়			
সরকারী	৬৮৫	৯,৬৭৮	২,৫৫,৫৭৭
বে-সরকারী	২১৪	৪,০৪৮	৮৮,৩২৫
বিশ্ববিদ্যালয়—			
সরকারী	১৫	২,৫৮১	২৪,২৫৮
বে-সরকারী	২২	২,২৬২	৫৬,৬৫৫

১৯২৯ সনে টোকিও ও ওসাকাতে দুইটি টেক্‌নিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় খোলা হইয়াছে।

মূক-বধির ও অন্ধ বিদ্যালয়—	সংখ্যা	শিক্ষক-সংখ্যা	ছাত্রছাত্রী সংখ্যা
সরকারী	২৩	২১২	২,৩৩০
বে-সরকারী	২২	১৮০	৮৮১
মূক-বধির অন্ধদিগকে যেখানে ব্যবসাদি শিক্ষা দেওয়া হয় সেইগুলি ধরিলে	১১৭	৮৫১	৬,৫২১
উচ্চশ্রেণীর কৃষি শিল্প ব্যবসায় প্রভৃতি শিক্ষার জন্য কলেজসমূহ Higher Agricultural and Forestry Schools (সরকারী) কৃষি ও বনপালন শিক্ষার জন্য	৬	২১২	১,৬০৫
Higher Agricultural Schools (সরকারী) কৃষি শিক্ষার জন্য	১	২৬	২১১
Higher Sericultural Schools (সরকারী) রেশম বিজ্ঞান-শিক্ষার জন্য	৩	১০১	
Higher Commercial Schools (সরকারী) ব্যবসা শিক্ষার জন্য	১১	৪৩১	৫,৯৪৮
Higher Technical Schools (সরকারী) শিল্প শিক্ষার জন্য	১৭	৬৯২	৬,৫১১
Higher Mining Schools (সরকারী) মাইনিং শিক্ষার জন্য		৩৯	২৩২
Pharmaceutical Schools (সরকারী) ঔষধ প্রস্তুত-প্রণালী শিক্ষার জন্য		৭৭	৫২৭

	সংখ্যা	শিক্ষক-সংখ্যা	ছাত্রছাত্রী-সংখ্যা
Higher Nautical (সরকারী) জাহাজ চালন শিক্ষার জন্য	২	১২৪	১,৪৫৯
Higher Dental School (সরকারী) দন্তরোগ শিক্ষার জন্য	১	২৭	১০০
Foreign Language Schools (সরকারী) বিদেশী ভাষা শিক্ষার জন্য ; এখানে নানা দেশীয় ভাষার সঙ্গে হিন্দুস্থানী শেখান হয়।	২	১৪৯	১,৫৪২
Fine Arts Academy (সরকারী) চিত্রবিদ্যা শিক্ষার জন্য	১	৭৫	৮৫৯
Academy of Music (সরকারী) সঙ্গীত শিক্ষার জন্য	১	৭৯	৩০৯
Special Schools (Collegiate) (সরকারী) ইহাদের অনেক স্কুলে শিল্প ইত্যাদি শেখান হয় (সরকারী)	১২	৪৩৬	৪,৪৮৬
ঐ (বে-সরকারী)	৭৯	৩৩৭৪	৫১,২৮৫
শিল্প ব্যবসায় প্রভৃতি শিক্ষার জন্য মধ্যশ্রেণীর স্কুল (সরকারী ও বে-সরকারী—১৯২৭ সনে যেমন ছিল)			
টেকনিক্যাল স্কুল	৮৫	১,৭০৪	২৪,৯৪৫
কৃষিবিদ্যালয়	১৮৭	২,০৯৭	৩৭,৪১৭
ফিসারি বা মৎস্য পালন ইত্যাদি শিক্ষার বিদ্যালয়	১১	১০৯	১৩,০০

	সংখ্যা	শিক্ষক-সংখ্যা	ছাত্রছাত্রী-সংখ্যা
ব্যবসা শিক্ষা	১০৯	৪,৪৮০	১,০৩,৫৬৯
ন্যাটিক্যাল বা জাহাজ চালন বিদ্যা শিক্ষার স্কুল	১২	১৪৩	২,৩২৯
অপরাপর বিদ্যা	৮৯	১,১৯৬	২৪,০৮১
মোট	৫৯৩	৯,৭২৯	১,৯৩,৬৭১

শিল্প ব্যবসা প্রভৃতি শিক্ষার জন্য উচ্চ প্রাথমিক শ্রেণীর স্কুল (সরকারী ও বে-সরকারী—১৯২৭ সনে যেমন ছিল)—

টেকনিক্যাল স্কুল	২৪	৩১৫	৪,২২০
কৃষিস্কুল	১৫১	৯৪০	২১,০৫২
ফিসারি স্কুল	১	৭	১৩২
ব্যবসা শিক্ষা	৪২	৩৮৬	৯,৩৯৩
ন্যাটিকাল স্কুল	১	৯	২৩৭
অপরাপর	৩১	১৯১	৪,৭১৮
মোট	২৬০	১৮৪৮	৩৯৭৫২

শিল্প ব্যবসা প্রভৃতি শিক্ষার জন্য continuation স্কুল, যেখানে কাজ করিতে করিতে কর্ম্মীরা শিক্ষা পাইতে পারে। (সরকারী ও বে-সরকারী—১৯২৭ সনে যেমন ছিল)

টেক্‌নিক্যাল স্কুল	১৩৬	২৯০	১২,৪৯৭
কৃষি	১২,৯৪৫	১১,৫৩৫	৯,২৮,৪৪৩
ফিসারি	১৯৬	১২২	১২,৩২৮
ব্যবসা	৫৫০	৯৫১	৪৮,৯৪১
ন্যটিকাল	২	—	২১৫
অপরাপর	১৪৬	১৪৯	১২,৪২১
মোট	১৩,৯৭৫	১২,০৫৭	১০,১৪,৮৩৫

শিল্প ব্যবসা প্রভৃতি শিক্ষায় স্কুলসমূহের জন্য শিক্ষক তৈয়ারির ট্রেনিং স্কুল—

সরকারী	৫০	৮৩	১,৬৬৮

অপরাপর স্কুল যাহা গবর্ণমেণ্ট বিশেষ কোন শ্রেণীর মধ্যে অনুমোদন করেন না—

সরকারী	২৫২	৩০৫	১৭,৭০৫
বে-সরকারী	১,৯৬৭	১৩,৫৬৮	২,০৭,৫৫১
উপরিলিখিত সমস্ত শিক্ষায়তন	৪৫,৯৩৭	৬,১২,৪০০	২৫,৭৮,৯৫১

ফিসারি ইনষ্টিটিউট্, সামরিক বিদ্যালয়, নৌযুদ্ধ শিক্ষার বিদ্যালয়, পিয়ার বা লর্ড শ্রেণীর বালকবালিকাদের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় এবং পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ বিভাগের বিদ্যালয়গুলি শিক্ষা বিভাগের অন্তর্গত নয় এবং উপরের তালিকাতে ধরা হয় নাই।

পরিশিষ্ট গ

জাপানের শ্রমশিল্প ব্যবসা

অধিবাসীদের জীবিকা

জাপানের অধিবাসীদের প্রায় প্রত্যেক পাঁচ জনের মধ্যে চারি জন পল্লীতে বাস করে। পল্লীর সংখ্যা হইতেছে ১০,৪১৪ এবং ছোট-বড় শহরের সংখ্যা ১৫,০১৯। একশত-একটি বড় শহর আছে। ইহাদের মধ্যে বাইশটির অধিবাসীর সংখ্যা এক লক্ষের উপর। ওসাকা শহরের সংখ্যা একুশ লক্ষের উপর এবং টোকিওর প্রায় কুড়ি লক্ষ। ক্ষুদ্র জাপানে কলিকাতার দ্বিগুণ বড় দুইটি শহর বর্ত্তমান। আরও তিনটি শহরের লোকসংখ্যা ছয় লক্ষের উপর।

অধিবাসীদের মধ্যে কাহার কি পেষা নিম্নলিখিত সংখ্যা হইতে একটা মোটামুটি ধারণা জন্মিবে।

সরকারী চাকুরি	৬,৯১,৩৯৬
সৈনিক বিভাগ	
নায়ক	১৭,২৩৪
সৈনিক	২,০৩,৮০৬
বিমান বিভাগ	৬,০০০
নৌ-বিভাগ	
নায়ক ও সৈনিক	১,৩৫,৬৮৩
বিমান বিভাগ	৬,৫০০
কৃষিজীবী	২,৬৯,৪৩,০০০
শ্রমিক কারখানা ইত্যাদিতে	১,৩৭,৮৭,০৪৯
কারখানায়	২১,৯৬,৫৫৮
খনিতে	২,৪৬,৭৮৭
ধীবরের কার্য্যে	৮,৬৪,৮০০
বন বিভাগে	৩,৯৯,৫০০
ব্যবসা-বাণিজ্যে	৭৬,৪৬,০০০
রেল ইত্যাদিতে	৪,৯০,৫৪৮
লবণ বিভাগে	৪৫,০৩৪
অপরাপর কার্য্যে	১৯,০০,৯১২

জাপানের পুলিশ বিভাগ

১৯২৮ সনে পুলিশ আপিস থানা ইত্যাদির সংখ্যা	১২২৭

কর্ম্মচারীর সংখ্যা ২১২৭

কনষ্টেবলের সংখ্যা ৬১,৯৫৫

ডাক্তার ইত্যাদির সংখ্যা (১৯২৮ সনে)

ডাক্তার ৪৭,৮৯১

দন্ত চিকিৎসক (Dentist) ১৪,৮৮১

ঔষধবিক্রেতা ১৭,১৮৯

ধাত্রী ৪৬,২৯৯

শুশ্রূষাকারিণী ৬৩,৪১৭

শ্যাম্পুকারী (ইহাদের প্রায় অর্দ্ধেকের বেশী অন্ধ) ইত্যাদি ৭০,১২১

সংবাদপত্রাদির সংখ্যা (১৯২৮)

দৈনিক ২৬৬

সাপ্তাহিক ৩৯৯

মাসে তিনবার প্রকাশিত ৪,১১৭

মোট ৫,৭৮২

মাসিক পত্রিকার সংখ্যা কেবল টোকিও হইতে প্রকাশিত ৬৭

১৯২৮ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত (সরকারী পুস্তক ইত্যাদি বাদে)

পুস্তকের সংখ্যা ১৯,৮৮০

ভাষান্তরিত পুস্তকের সংখ্যা ৭,৬০৮

সাময়িক পত্রিকা (Periodicals) ৩২,৭৮১

জাপানে ১৯২৮ সনে সিনেমার সংখ্যা—১,১৭২

ফিল্মকারী ও ফিল্ম আমদানীকারী— ৬৯

নট (Actors)—	১০১৬
নটী (Actresses)—	৪৩০
ফিল্ম্ পরিচায়ক। জাপানে প্রথা হইতেছে যে, সিনেমাতে প্রদর্শিত-চিত্রের বিবরণ একজন চিত্রের সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া যায়।	৬,৮১৮

শিক্ষকদের সংখ্যা শিক্ষায়তনগুলির বিবরণে দেওয়া হইয়াছে।

প্রায় সাতলক্ষ দশ হাজার জাপানী বিদেশে বসবাস করিতেছে এবং প্রতি বৎসর প্রায় কুড়ি হাজার বিদেশে যায়। এখন মাঞ্চুরিয়ায় প্রায় আড়াই লক্ষ, এশিয়ার অন্যান্য স্থানে প্রায় পঞ্চাশ হাজার, প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে প্রায় দেড় লক্ষ, আমেরিকার যুক্ত রাজ্য, কানাডা ও মেক্সিকোতে প্রায় একলক্ষ সত্তর হাজার এবং দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিল, পেরু, আর্জেণ্টাইন, বলিভিয়া ও চিলিতে প্রায় এক লক্ষ জাপানী আছে। ব্রেজিলেই প্রায় সাতাত্তর হাজার জাপানী কফি, ধান ইত্যাদি চাষ করিতেছে।

কৃষি

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে প্রত্যেক একশত গৃহস্থের মধ্যে প্রায় ছাপ্পান্নটি কৃষিকার্য্য করিত। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে কৃষক-গৃহস্থের সংখ্যা কমিয়া উনপঞ্চাশটি হইয়াছিল। শিল্পে উন্নতি ইহার প্রধান কারণ। প্রত্যেক শত কৃষক-গৃহস্থের মধ্যে নব্বইটি কোন-না-কোন উপশিল্প দ্বারা নিজেদের আয় বৃদ্ধি করে। ইহাদের মধ্যে প্রায় চল্লিশটি রেশম পালন করে।

জাপানের প্রায় সাড়ে চারি কোটি বিঘা কর্ষণযোগ্য জমির মধ্যে প্রায় দুই কোটি তেত্রিশ লক্ষ বিঘা জমিতে, অর্থাৎ প্রতি একশত বিঘা

জমির মধ্যে পঞ্চান্ন বিঘাতে ধান চাষ হয়। প্রায় পয়তাল্লিশ লক্ষ বিঘা জমিতে তুঁত চাষ করিয়া রেশমকীট পালন করা হয়।

জাপানের কৃষকদের জমি অল্প। প্রতি একশত কৃষকের মধ্যে পঁয়ত্রিশ জনের জমির পরিমাণ—পৌনেচারি বিঘার কম।

৩৪	জনের	,,	পৌনেচারি হইতে সাড়েসাত বিঘা
২২	,,	,,	সাড়েসাত হইতে পনর বিঘা
৬	,,	,,	পনর হইতে সাড়ে বাইশ বিঘা
২	,,	,,	সাড়েবাইশ হইতে সাঁড়েসাঁইত্রিশ বিঘা
১	,,	,,	সাড়েসাঁইত্রিশ বিঘার উপর

জাপানে এই সকল ফসলের চাষ হয়—ধান, যব, গম, জনার, ভুট্টা, দেবধান্য, Buckwheat, আলু, মিষ্টি আলু, শিম, মটর Horse bean, Red bean, Soya bean, সরিষা, হেম্পপাট, তুলা, তামাক, মূলা, গাজর, ফ্ল্যাক্স পাট, কপি, পেঁয়াজ ইত্যাদি।

ফলের মধ্যে আপেল, ন্যাস্‌পাতি, লেবু, আঙ্গুর, আলুবোখারা এবং পাসিমন জন্মে।

ছয়টি জেলায় প্রায় সওয়া লক্ষ বিঘা জমিতে চা চাষ হয়।

বনজ

জাপানের সমস্ত জমির অর্দ্ধেকের কিছু বেশী পরিমাণে বন-জঙ্গল আছে। এই সকল বন হইতে গৃহাদি নির্ম্মাণের কাঠ ও বাঁশ পাওয়া যায়। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে কাঠের দাম হইয়াছিল ১১,৮৯,০১,০০০ ইয়েন। ইহার প্রত্যেক শত ভাগের মধ্যে সম্রাটের ছয় ভাগ, মূল্য ৮৮,৩৫,২০৯ ইয়েন; গবর্ণমেণ্টের চৌত্রিশ ভাগ। মূল্য ১৮,১৫,৬১,৪৫ ইয়েন; সাধারণের (Communal) উনিশ ভাগ। মূল্য ৩,৮৭,৩,৬৫৯ ইয়েন;

দেবোত্তর মন্দিরাদির এক ভাগ, মূল্য ৫,৬৯,৬১৬ ইয়েন ; এবং ব্যক্তি-বিশেষের চল্লিশ ভাগ মূল্য ৮.৫০,২৩,৭৯৪ ইয়েন।

ইহা ছাড়া বীজ, ফল,. গাছের ছাল, বেঙের ছাতা (mushroom) রজন, কাঠকয়লা ইত্যাদি হইতে পাওয়া যায় ১৩,৮৪,৬৯,০০০ ইয়েন।

বাঁশের মূল্য হইয়াছিল ৫৭,২১,১২২ ইয়েন এবং জ্বালানী টুকরা কাঠের মূল্য ৭,১৯,৬৫,৩৬৩ ইয়েন।

বনবিভাগে শ্রমশিল্পের মধ্যে এইগুলি প্রধান। কাঠ ফাড়াই ইত্যাদি কারখানা—সংখ্যা ১,৮২৬ এবং ইহাদের কর্ম্মী সংখ্যা—৩৫,১৪৬
কাগজ প্রস্তুত করিবার উপযোগী

পাল্প—	৫,৭৩,২৭৬ টন
দিয়াশলাইয়ের কাঠি	১৫,২৬,৯১৩ মূল্যের

বিদেশে চালান দেওয়া হয়।

পেন্সিলের কাঠ, চেস্ বোর্ড, ছিপি এবং য়্যাসিটিক এসিড তৈয়ারিও বনবিভাগের শ্রমশিল্পের ভিতর।

খনিজ

জাপানে জাপানীদেরই প্রয়োজনোপযোগী খনিজ পদার্থ উৎপন্ন হয় না। তাহা হইলেও এই সকল পদার্থের উৎপন্নের যথেষ্ট বন্দোবস্ত আছে। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে সোনা, রূপা, তামা, সীসা, টিন, দস্তা, লোহা, ম্যাঙ্গানীজ, গন্ধক, কয়লা, কেরোসিন ও পেট্রল প্রভৃতি ৩৭,৮৪,৭৭,০০০ ইয়েন মূল্যের উৎপন্ন হয়। তিনশত একাত্তরটি কোম্পানী এই সকল কাজ চালায় এবং ২,৯৩,১৭২ লোক নিযুক্ত করে।

সমুদ্রজ

জাপানের চারিদিকে সমুদ্র থাকায় মৎস্য, কাঁকড়া, শামুক ইত্যাদি

এবং সামুদ্রিক শ্যাওলা সংগ্রহ এবং এই সকলের ব্যবসা বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে এই সকলের মূল্য হইয়াছিল ১০,৯২,৬৪,০০০ ইয়েন। ইহাদের কতক তাজা অবস্থায় এবং কতক শুষ্ক বা রক্ষিত অবস্থায় খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। আর কতক হইতে সার, তৈল ও শিরীষ তৈয়ারি হয়।

এই সকল কার্য্যে এই বৎসর মোট ১৪,৯৮,২৫৮ লোক নিযুক্ত ছিল। মৎস্য ইত্যাদি ধরিবার নৌকার সংখ্যা ছিল ৩,৬০,১২৬ এবং ইহাদের মধ্যে ২৫,৪৪৫-টিতে ইঞ্জিন লাগান।

গভীর সমুদ্রে মৎস্য ধরিবার উপযোগী নৌকার জন্য গবর্ণমেণ্ট আংশিক অর্থ সাহায্য করেন। ৮,০৯০ নৌকা ১,০৬২,০৩ মাঝিমাল্লার সহিত ৮,০৮,৭১,৯৬১ ইয়েন মূল্যের মৎস্য ধরে এবং সত্তরটি ট্রলার জাহাজে ১,০১,৫৮,৯৯৯ ইয়েন মূল্যের মৎস্য ধরে। ট্রলারগুলি সমস্ত গবর্ণমেণ্টের হাতে আছে।

তিমি মৎস্য ধরিবার জন্য ত্রিশখানি জাহাজ ছিল এবং ইহার দ্বারা ২১,৩৬,৬২৪ ইয়েন মূল্যের ১,৪৫০-টি তিমি ধরা হয়।

১,২০,৯৪১ ইয়েন মূল্যের প্রবাল (coral) সংগ্রহ করা হয়। ইহার সমস্তই প্রায় ইতালীতে চালান যায়।

জাপানে হ্রদগুলিতেও মৎস্য, শামুক ইত্যাদির চাষ খুব বেশী। এই বৎসর এই সকলের উৎপন্ন মূল্য হইয়াছিল ২,৩৫,৬৬,০০০ ইয়েন। কোন কোন ধানের জমিতেও মৎস্য পালিত হয়।

কৃত্রিম মুক্তাশুক্তি—জাপানের কোন কোন স্থানে স্বাভাবিক মুক্তা পাওয়া যায়, কিন্তু মিকিমোতোর কৃত্রিম উপায়ে মুক্তার চাষ আশ্চর্য্যজনক ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্বাভাবিক উপায়ে মুক্তার উৎপত্তি এইরূপ। এক প্রকার সামুদ্রিক শুক্তি বা ঝিনুকের শরীরে

যদি বালুকণা বা অপর কোন বাহ্যিক পদার্থ প্রবেশ করে তাহা হইলে শরীর হইতে ইহার চারিদিকে রস জমিয়া শক্ত হইয়া মুক্তায় পরিণত হয়। মিকিমোতো প্রায় কুড়ি মাইল পরিমাণ সমুদ্র-কিনারায় ঝিনুকের চাষ করিয়া কৃত্রিম উপায়ে ইহাদের শরীরে বাহ্যিক পদার্থ প্রবেশ করাইয়া দিয়া মুক্তার চাষ করে। ওমুরা বে পার্ল কোম্পানীও স্বাভাবিক মুক্তা সংগ্রহ ছাড়া এখন এই উপায়ে মুক্তা উৎপন্ন করে। এই বৎসর ৭৭,৯৭২ ইয়েন মূল্যের ঝিনুক এবং ৪,৮৪,৯৪৭ ইয়েন মূল্যের মুক্তা উৎপন্ন হইয়াছিল।

শিল্প

শিল্পশিক্ষা এবং পরীক্ষা ও গবেষণাদির বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া ও আধুনিক যন্ত্রপাতি গ্রহণ করিয়া জাপান শিল্পের কত উন্নতি করিয়াছে তাহা কাহারও অবিদিত নাই। এমন নিত্যব্যবহার্য্য জিনিষ নাই যাহা জাপানে প্রস্তুত হয় না। বিগত মহাযুদ্ধের সময় জাপানের মরশুম পড়িয়া যায় এবং শিল্পের বহু উন্নতি সাধিত হয়। তবে জাপান এক মস্ত ভুল করিয়াছিল। সস্তায় উৎপন্ন ও সস্তায় বিক্রয় মূলমন্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল এবং ইহার দরুণ অতি খেলো মাল চালাইতে হইয়াছিল। কখনও কখনও পর-পর জাপানী পাঁচ ছয়টি লণ্ঠনের চিমনী ফাটিয়া গিয়াছে। এই কারণে জাপানী জিনিষের বদনাম হয় এবং 'জাপানী' বলিতে খেলো মাল বুঝায়। জাপান এই বদনাম ঘুচাইবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছে এবং যেখানে সম্ভব গবর্ণমেণ্ট আইন করিয়া দিয়াছেন যে, বিনা পরীক্ষায় মাল বিদেশে চালান দেওয়া হইবে না এবং এই পরীক্ষার জন্য আপিস খোলা হইয়াছে এবং পরীক্ষা সুরু হইয়াছে। পরীক্ষার পর শীলমোহর বা ছাপ না দিলে মাল চালান দেওয়া হয় না এবং যদি বিনা পরীক্ষায় চালান দেওয়া হয়, তবে চালানকারীর বহু

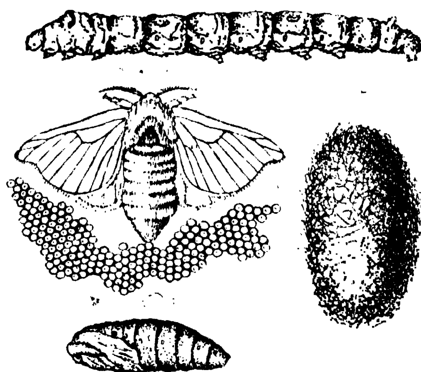
অর্থদণ্ড, এবং এমন কি কারাদণ্ডেরও বিধান আছে। অল্প দিন পরেই দেখা যাইবে যে, জাপানী জিনিষের বদনাম দূর হইয়া গিয়াছে। এখনই ত জাপান সুতা রেয়ন ও রেশম কাপড়ের ব্যবসায়ে ইংলণ্ড, জার্ম্মানী, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশকে পরাস্ত করিয়াছে।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে পাঁচটির অধিকের শ্রমিক নিযুক্তকারী কারখানার সংখ্যা ছিল ৩১,৭১৭ এবং শ্রমিকের সংখ্যা ৯,৮৮,২৬৫ ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে কারখানা বা ফ্যাক্টরীর সংখ্যা ছিল ৫৫,৯৬৮ এবং ইহাদের কর্ম্মী-সংখ্যা ১৯,৩৬,২৫৯। কারখানাগুলি কোন কোন শিল্পের এবং হস্তচালিত কি বিজলী ও বাষ্প চালিত এবং কোনটিতে কত কর্ম্মী ছিল তাহা নীচে দেওয়া গেল—

কোন শিল্পের কারখানা	কারখানার সংখ্যা হস্ত চালিত	বিজলী ও বাষ্প চালিত	কর্ম্মী-সংখ্যা
বস্ত্রবয়ন	২,৫৫৬	১৭,১২৬	৯,৯৪,২৪৬
মোটর, ইঞ্জিন ইত্যাদি নির্ম্মাণ	৩৪১	৩,৭৫১	১,২১,৭০৩
রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত	৪৩৬	২,৩১০	১,২০,১৫২
খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত	২,২১৬	১০,৪৭৬	১,৬৭,৬৫১
যন্ত্রপাতি তৈয়ারি	৪৩৬	৪,০৯৬	২,৫০,৬৫৭
চীনামাটির বাসন তৈয়ারি	১,০৪৮	১,৭৩৪	৬৮,২৪৮
কাঠের জিনিষ তৈয়ারি	৭৬৯	৩,২৯৪	৫৬,৬৩১
ছাপাখানা	১০৩	২,৪১২	৫৪,২২০
বিজলী ও গ্যাস উৎপাদন	৪১	৪০৪	৮,৬৪২
নানাবিধ	১,৯৫৯	২,৮৬০	৯০,১০৯
গবর্ণমেণ্টের কারখানা	৩৩	২৩৮	১,৩৬,০৩২

রেশমশিল্প

রেশমকীট বা পলু হইতে যে-সুতা পাওয়া যায় তাহার নাম রেশম। পলু তুঁত গাছের পাতা খায় এবং বড় হইলে মুখ হইতে রেশমসুতা বাহির করিয়া গুটী করে এবং এই গুটীর ভিতর পুত্তলি হয়। পরে প্রজাপতি বা চোকৃড়া চোকৃড়ী হইয়া পুত্তলিকোষ ভাঙ্গিয়া এবং গুটী



পলুর জীবনী

উপরে পলু, মধ্যে বামদিকে চোকড়ী ডিম পাড়িতেছে এবং ডানদিকে গুটী। নীচে পুত্তলি গুটী হইতে বাহির করিয়া পৃথক দেখান।

ভেদ করিয়া বাহির হয়। বাহির হইবার পরেই চোকৃড়া চোকৃড়ীর সঙ্গম হয় এবং পরে চোকৃড়ী ডিম পাড়ে। এই ডিম হইতে পলু ফুটিয়া পাতা খায় এবং আবার গুটী করে। এই হইল রেশমকীটের জীবনী।

চোকৃড়া চোকৃড়ী কাটিয়া বাহির হইবার পূর্ব্বে গুটীকে গরম জলে

সিদ্ধ করিয়া গুটীর তারতম্য অনুসারে এক একটি হইতে দুইশত, চারিশত, ছয়শত, আটশত বা হাজার গজ লম্বা রেশমসুতা বাহির করিয়া লইতে পারা যায়। সরু সুতার জন্য চার-পাঁচটি এবং মোটার জন্য বেশী গুটীর খাই এক সঙ্গে করিয়া সুতা কাটাই করিবার প্রথা ও যন্ত্র আছে এবং কারখানায় অনেক কাটুনী নিযুক্ত করিয়া কাটাই করা হয়। বাঙ্গালা দেশে পুরুষে কাটাই করে। কিন্তু চীন, জাপান, ফ্রান্স, ইতালী প্রভৃতি দেশে বালিকা ও স্ত্রীলোকেরাই কাটানীর কার্য্য করে। এই রূপে প্রস্তুত রেশমসুতার নাম হইল কাচা রেশম (raw silk)।

কাচা রেশম হইতে কাপড় বুনিবার জন্য ইহার নানা রকম পাট করিতে হয়। প্রথম সুতার খাইকে বা কয়েকটি খাই একত্র করিয়া পাক্ দিতে হয়। সাধারণ থান, ক্রেপ্ ইত্যাদি বুনিবার জন্য নানা রকমে পাক্ দিতে হয়। পাকাই কার্য্য এখন যন্ত্র-সাহায্যে কারখানাতে সাধিত হয়। পাক্ দেওয়া সুতাকে পাকোয়ান সুতা বলে।

পাকাইয়ের পর নানারকম রঙীন্ কাপড়ের জন্য সুতার রঙ করিতে হয়। তারপর কাপড় বুনা হয়। বুনার পর কাপড়কে ধোলাই ও ইস্ত্রি করিয়া বেশ সুন্দর ভাবে ভাঁজ করিয়া বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত করা হয়। ধোলাই ও ইস্ত্রি-করণের জন্যও নানা প্রথা এবং যন্ত্র হইয়াছে এবং এই কার্য্য এখন বড় বড় কারখানাতেই সম্পন্ন করা হয়। তাঁতিরা ঘরে এই কার্য্য করে না।

মাত্র এক রঙ্ করিতে হইলে কাপড় বুনিয়া গোটা কাপড় রঙ্ করা হয়। ইহারও কারখানা আছে।

এখন রেশমশিল্পের বিভাগ হইল—

১। পলুপালন

২। সুতা কাটাই

৩। সুতা পাকাই

৪। সুতা রঙাই

৫। কাপড় বুনন

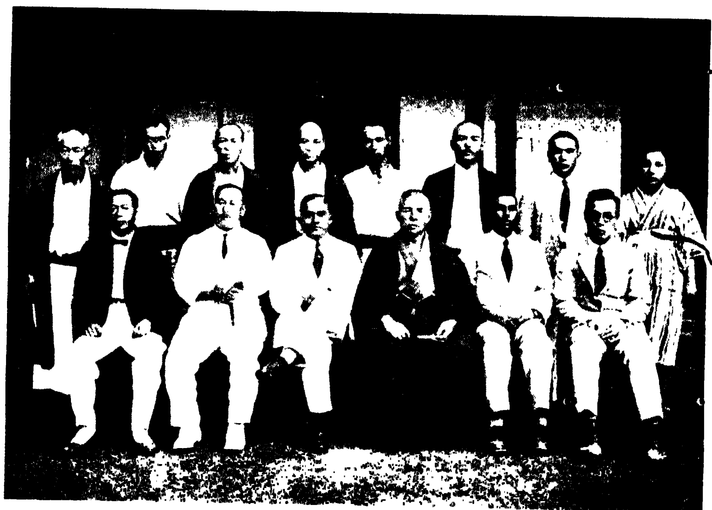
৬। কাপড় রঙাই

৭। কাপড় ধোলাই ও ইস্ত্রি-করণ

পলুপালন কৃষকদের উপশিল্প। ইহার আবার কয়েকটি বিভাগ আছে। যথা—তুঁতের চাষ, পলুর ডিম উৎপাদন, এবং পলু পালন।

কৃষকেরাই তুঁত-চাষ করে। প্রথমে বীজ হইতে চারা জন্মাইয়া, চারার উপর কলম বান্ধিয়া এই কলম হইতে তুঁত চাষ করা হয়। প্রায় দুই লক্ষ কৃষক তুঁতের কলম উৎপাদন করিয়া বিক্রয় করে এবং ইহাদের বিক্রয়ের পরিমাণ বৎসরে সাতচল্লিশ লক্ষ ইয়েন।

পলুদের পেব্রিন্ নামক এক মারাত্মক রোগ জন্মে। চোকৃড়ীর শরীরে এই রোগের বীজ থাকিলে সন্তানেরও রোগ হয়। এই কারণে চোকৃড়ীর শরীরের রক্ত অনুবীক্ষণ যন্ত্র-সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া রোগ-শূন্য দেখিলে তবে সেই চোকৃড়ীর ডিম পালিত হয়। সাধারণ কৃষকের পক্ষে এইরূপ পরীক্ষা করা সম্ভব নয়। সেই জন্য কোন কৃষককেই ডিম উৎপাদন করিতে দেওয়া হয় না। গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে সমস্ত ডিম উৎপন্ন হয়। প্রায় ৮,০০০ লোককে ডিম উৎপাদনের লাইসেন্স্ দেওয়া হইয়াছে। ইহাদের প্রত্যেকে অবস্থাপন্ন এবং পনের-কুড়ি হইতে ত্রিশ-চল্লিশ জন লোক নিযুক্ত করিয়া তুঁত চাষ করে এবং পলু পুষিয়া কেবল ডিম বিক্রয় করে। প্রত্যেকবার ডিম উৎপাদনের জন্য গবর্ণমেণ্ট গবেষণা-কেন্দ্র হইতে ইহাদিগকে ডিম দেওয়া হয়। আবার ইহাদের দ্বারা উপন্ন চোকৃড়ী ও ডিম পরীক্ষা করিয়া তবে ডিম



গ্রাম্য পশু-পালকদিগের সমিতি

পৃঃ ৮০

বিক্রয় করিতে দেওয়া হয়। এই পরীক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্টের তিনশত তেতাল্লিশটি কেন্দ্র আছে এবং আটশত তেত্রিশ জন বিশেষজ্ঞ এবং দুই-শত চৌত্রিশ জন কেরাণী নিযুক্ত আছে এবং প্রায় সত্তর হাজার বালিকা অনুবীক্ষণ যন্ত্র-সাহায্যে পরীক্ষা করিবার জন্য প্রতি বৎসর পাঁচ-ছয় মাসের জন্য নিযুক্ত হয়।

যে-ডিম পাস করা হইয়াছে পলুপালনকারীরা তাহা ক্রয় করিয়া পলু পালন করে। প্রায় চল্লিশ হাজার লোকের মারফতে দেশময় ডিম বিক্রয় হয়। ইহারা হইল ডিম বিক্রয়ের দালাল।

পলুপালনকারী গৃহস্থের সংখ্যা প্রায় বাইশ লক্ষ যোল হাজারের উপর। গুটী হইলেই বিক্রয় করিয়া দেওয়া হয়। গুটী বিক্রয় করিয়া গড়ে প্রত্যেক গৃহস্থ আড়াই শত ইয়েনের উপর পায় এবং ~~গড়ে~~ প্রত্যেকের তুঁতের পরিমাণ প্রায় দুই বিঘা। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে উৎপন্ন গুটীর মূল্য হইয়াছিল ৬৫,৫০,০১,০০০ ইয়েন।

গুটী বিক্রয়ের দালালি করিয়া প্রায় ১,০৫,০০০ লোক জীবিকা উপার্জ্জন করে।

অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় পলুপালকদিগের সমিতি আছে। সমিতির উদ্দেশ্য হইতেছে উন্নত উপায়ে তুঁত চাষ করা, পলু পালন করা এবং উত্তম গুটী উৎপাদন করা। অনেক গ্রাম্য সমিতি বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করিয়াছে। এইরূপ একটি সমিতি পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলাম।— লেখকের সহিত এই সমিতি কর্তৃক গৃহীত একখানা ফোটোগ্রাফ লওয়া গেল। এই চিত্র হইতে পরিচ্ছদাদি সম্বন্ধে কিছু জানা যায়। পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া লেখক। বাম পার্শ্বে সমিতির সভাপতি। ইনি এখন গ্রামের মণ্ডল। ইনি ভদ্র জাপানী পোষাক পরিহিত। তাঁহার বাম পার্শ্বে এক ভারতীয় বন্ধু এবং তাঁহার বামে

জেলার রেশম গবেষণা-প্রতিষ্ঠানের রসায়নাগারের একজন সহকারী। লেখকের ডান দিকে স্থানীয় পলুর ডিম পরীক্ষা-কেন্দ্রের সহকারী অধ্যক্ষ এবং তাঁহার ডানদিকে এই গ্রাম্য সমিতির বিশেষজ্ঞ। ইঁহার বেতন মাসে পঞ্চাশ ইয়েন। পশ্চাতে দাঁড়াইয়া সমিতির সভাপতির কন্যা, তাহার পার্শ্বে স্কুলের দুইজন শিক্ষক এবং পাঁচজন কৃষক। ইহারা সমিতির সভ্য। এই চিত্র হইতে পোষাক সম্বন্ধে জাপানী জাপান এবং পাশ্চাত্য পন্থাবলম্বী জাপানের বেশ ধারণা হয়।

কাটাই কারখানাগুলি গুটী ক্রয় করিয়া কাঁচা রেশম কাটাই করে। প্রত্যেক কাটানীর জন্য জল গরম করিয়া কাটাই করিবার পৃথক পাত্র থাকে। এই পাত্রকে ঘাই বলে। গৃহস্থ দুই পাঁচ ঘাই [illegible] কাঠের কয়লার আগুন করিয়া ঘাই গরম করা হয়। কারখানায় বাষ্প (steam) ব্যবহৃত হয়। জাপানে প্রথমে ঘর খাইয়েরই চলন ছিল। মেজি অব্দের প্রথমে বিলাতী বাষ্প ঘাই আনিয়া পরীক্ষা করিয়া গ্রহণ করা হয়।

এখন জাপানের কাটাই শিক্ষা কত বড় তাহা বুঝাইবার জন্য ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের অঙ্ক নীচে দেওয়া গেল।

	ঘাইয়ের সংখ্যা	কারখানার সংখ্যা
১০ ঘাইয়ের কম—	৮৬,৮০৮	৬৫,৪৩১
১০—৫০ ঘাই—	৫১,০৩০	১,৯৯৭
৫০—১০০ ,, —	৬৫,৮৯২	৯৮৫
১০০—৩০০ ,, —	১,২২,২১৩	৯৯৪
৩০০ ঘাইয়ের বেশী	১,১১,৭৯৫	
	৪,৩৭,৭৩৮	৬৯,৪০৭

ঘাইগুলির মধ্যে ঘরঘাই ৭৯,০৯৪ এবং বাষ্প ঘাই ৩,৫৮,৬৪৪ এবং

কর্ম্মী-সংখ্যা ঘরযাইয়ে ৭৮,৪৪৪ এবং বাষ্প যাইয়ে ৪,৪৬,৮৬৩। কারখানার মালিকদিগকে ইহার মধ্যে ধরা হয় নাই।

১৯২৯ খৃষ্টাব্দে কাঁচা রেশম ও কাটাই করিবার সময় যে ঝুট হয় তাহার মূল্য হইয়াছিল ৮৮,১৩,৭৭,০০০ ইয়েন। ৮১,২০,৮১,০০০ ইয়েন মূল্যের এই সকল জিনিষ বিদেশে চালান দেওয়া হয়।

রেশমশিল্পের বাকী বিভাগগুলির মধ্যে পাকাই, রঙাই, ধোলাই ও কারখানার কাজ। ধনিক বা কোম্পানী কর্ম্মী নিযুক্ত করিয়া যন্ত্রের সাহায্যে এই কার্য্য করে। বুনন তাঁতিদের গৃহশিল্প। অধিকাংশ তাঁতই এখন বিজলীর সাহায্যে চালিত হইতেছে। অধিকাংশ তাঁতিই নিজ গৃহে দুইটি চারিটি ছয়টি তাঁত চালায়। তাঁতিদের সমিতি আছে। কিরূপ কাপড় বুনিতে হইবে সে সম্বন্ধে এই সমিতি সভ্যদিগকে উপদেশ দেয়, বুনা হইলে কাপড় একত্র করিয়া দেখে ঠিকমত মোটা সুতায়, টানা ও পড়েনে ঠিক সংখ্যক সুতায় এবং দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ঠিক বুনা হইয়াছে কি-না। তারপর কাপড় ধোলাই ও ইস্ত্রি করা হয়। পরে গবর্ণমেণ্টের পরীক্ষাগারে পাঠান হয়। তাহারা পরীক্ষা করিয়া ছাপ দিলে চালান দেওয়া হয়। এখন বারটি স্থানে কাপড় পরীক্ষাগার স্থাপিত হইয়াছে।

জাপানের উৎপন্ন রেশমবস্ত্রের মূল্য এখন প্রায় পঞ্চান্ন কোটি ইয়েন এবং প্রায় পনর কোটি ইয়েনের রেশম বস্ত্র বিদেশে চালান হয়।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দে এই সকল বয়নের জন্য

কারখানার সংখ্যা	৮৪,৫১২
তাঁতের সংখ্যা, হস্তচালিত	১,০৮,৩৩৬
বিজলী চালিত	১,১২,২৫৮
কর্ম্মী সংখ্যা	২,২০,১৮৫

পাকাই রঙাই ধোলাই কারখানাতে এবং বস্ত্রব্যবসায়ে কত লোক জীবিকা উপার্জন করে তাহার জন্য শুষ্ক অঙ্কসংখ্যা দেওয়া প্রয়োজন মনে করি না।

১৮৬০--৭০ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা দেশ হইতে দেড় কোটি টাকা মূল্যের কাঁচা রেশমসূতা চালান দেওয়া হইত। তখন চীন ও জাপান হইতে কোন রেশম বাহিরে চালান দেওয়া হইত না। বাঙ্গালায় রেশমশিল্পের উন্নতির জন্য কোন চেষ্টাই করা হয় নাই। ইহার ফলে বাঙ্গালার রেশমের এখন বিদেশী বাজারে স্থান নাই বলিলেই হয়।

জাপান যে রেশমশিল্পে এতটা উন্নতি করিতে পারিয়াছে, তাহার একমাত্র কারণ, রেশমশিল্পের সকল বিভাগের উন্নতির জন্য জাপানীদের ঐকান্তিক অনুসন্ধিৎসা ও ব্যাপক প্রচেষ্টা। এখন তুঁত ও পলুর উন্নতির জন্য গবেষণাকেন্দ্রের সংখ্যা সাতাত্তর এবং এই সকল কেন্দ্রে বিশেষজ্ঞের সংখ্যা ৪০৬ এবং সহকারীদের সংখ্যা ১৫৫।

গবেষণা এবং ডিম পরীক্ষা-কেন্দ্রগুলির জন্য গবর্ণমেণ্ট প্রতি বৎসর প্রায় এক কোটি দশ লক্ষ ইয়েন খরচ করে। পাকাই, রঙাই, বুনন ইত্যাদির জন্য পৃথক গবেষণা-কেন্দ্র আছে।

বয়নশিল্প

(ক) সুতাকাটা

কার্পাসের সুতা—গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে জাপান এই শিল্পে অসাধারণ উন্নতি করিয়াছে। এখন যত জিনিষ বিদেশে চালান দেওয়া হয় তাহার মোট মূল্যের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কাপড়ের সুতা ও কাপড়। অল্প বেতনে বালিকা কর্মী, মোটা বিশ নম্বর সুতার

কাট্‌তি এবং প্রায় দরজার কাছেই, অর্থাৎ চীন, মালয় দ্বীপপুঞ্জ এবং ভারতবর্ষে, বাজার পাওয়ায় দ্রুত উন্নতির সুবিধা হইয়াছে। জাপানে তুলা হয় না বলিলেই হয় এবং ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে চারি শত পাউণ্ড ওজনের কত গাঁইট তুলা কোন্ দেশ হইতে আমদানী করা হইয়াছে তাহার তালিকা দেওয়া গেল।

ভারতবর্ষ	১৬,৭২,০০০	গাঁইট
আমেরিকা	১২,১৭,০০০	,,
চীন	৪,৭২,০০০	,,
ইজিপ্ট	৪১,০০০	,,
অপরাপর দেশ	৬৮,০০০	,,

উল্লিখিত সকল প্রকার তুলা মিশাইয়া জাপান সুতা প্রস্তুত করে। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে ৫,৫৩৮-টি টাকুতে ৩৫,৩৫২ পুরুষ ও ১,২৩,৯৪০-টি বালিকা কর্ম্মী সুতা কাটার জন্য নিযুক্ত ছিল। ইহা ছাড়া মাঞ্চুরিয়া, সাংহাই, সিংটাও প্রভৃতি স্থানে জাপানীদের ১৫,৭৪,২৮৪-টি টাকু চলিয়াছিল এবং চীনা কোম্পানীর ১,২৫,০০০-টি টাকু জাপানীরা চালাইয়াছিল।

রেশমের কাটাসুতা—যে সকল রেশমের গুটী খারাপ হইয়া যায় এবং কাটাই করা যায় না সেই সকল গুটা ও ঝুটা রেশম দিয়া কলে কার্পাসের মত সুতা কাটা যায়। এইরূপ রেশমের কাটাসুতা জাপানে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ৬,০০,৪৪,৩৯৫ ইয়েন মূল্যের প্রস্তুত হইয়াছিল।

হেম্পপাটের সুতা কাটা—১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ষোলটি কারখানায় ১,৭৫,৯৯,৪২০ ইয়েন মূল্যের সুতা কাটা হয়।

রেয়ন্ বা মেকী-রেশম সুতা কাটা—এই কার্য্য মাত্র ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হয়। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তুইটি মিল ছিল, কিন্তু

১৯২৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে দশটি মিল হয়। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে প্রায় এককোটি পাউণ্ড এবং ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে পৌনে তিনকোটি পাউণ্ড সুতা উৎপন্ন হয়। ইহার উপরও সওয়া ছয়লক্ষ পাউণ্ড সুতা আমদানী করা হয়। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে যাহাতে দশ কোটি পাউণ্ড উৎপন্ন হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা হইয়াছে।

কাঠ, বিশেষতঃ পাইন কাঠ, গলাইয়া এবং এই গলিত কাঠকে সরু ছিদ্র দিয়া বাহির করিয়া শুকাইলে রেয়ন সুতা হয়। এই কার্য্য কলে ছাড়া হইতে পারে না।

(খ) বস্ত্রবয়ন

১৮২৯ খৃষ্টাব্দে কারখানার সংখ্যা	১,৭১,০৪৭	
এই সকল কারখানায় তাঁতের সংখ্যা বিজলী-চালিত	৪,০৮,৯৪৩	
হস্তচালিত	২,২৮,২৮৮	

এবং এইগুলিতে প্রত্যহ ৫,৬৬,৬৬৪ কর্ম্মী কাজ করিয়াছিল এবং উৎপন্ন হইয়াছিল—

রেশমবস্ত্র	৪৯,০১,৮২,০০০	ইয়েনের
রেশম ও কার্পাস মিশ্রিত বস্ত্র	৫.৭৯,৮৭,০০০	,,
কার্পাস বস্ত্র	৭৮,৪৬,৩৪,০০০	,,
হেম্পের কাপড়	১,৮৭,৪০,০০০	,,
উলের কাপড়	২২,০৪,১৯,০০০	,,

(১) পাঁচটির বেশী কর্ম্মী নিযুক্তকারী কার্পাসবস্ত্রের

কারখানার (মিলের) সংখ্যা ছিল		৭৩,২১৫
ইহাদের তাঁতের	,,	৩,৬৯,৯৪৭
দৈনিক কর্ম্মীর	,,	২.৮১,৩৬৩

(২) রেশম ও রেশম-কার্পাস মিশ্রিত কাপড়ের কারখানার সংখ্যা ছিল	৮৪,৫১২
ইহাদের বিজলী চালিত তাঁতের সংখ্যা	১,১২,২৫৮
হস্তচালিত ,, ,,	১,০৮,৩৩৬
দৈনিক কর্ম্মীর ,,	২,২০,১০৫
(৩) হেম্প বয়নকারী গৃহস্থের সংখ্যা	১৭,৬৬৮
তাঁতের সংখ্যা	২৩,৯৯৭
দৈনিক কর্ম্মীর সংখ্যা	২৪,৭৭৪
(৪) উল বুনন কারখানার সংখ্যা	৮৫২
দৈনিক কর্ম্মীর সংখ্যা	৪০,৩৩২

(৫) রেয়ন বা মেকি-রেশম বয়ন—রেয়ন বয়ন তাঁতেই হয় এবং রেশমবয়নকারী তাঁতিরাই উহা বয়ন করে। এই রেয়ন বয়নে তাহারা গত দুই-তিন বৎসরের মধ্যে অসাধারণ উন্নতি করিয়াছে। উপরে প্রদত্ত রেয়ন সুতাকাটার উন্নতি হইতে ইহা প্রকাশিত হয়। রেয়ন বস্ত্র-ব্যবসাতে জাপান এখন অপর সকল দেশকেই পরাস্ত করিয়াছে। ভারতবর্ষে জাপানী রেয়নবস্ত্রের কাটতি গত দুই বৎসরে তিন গুণ বাড়িয়া গিয়াছে। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের প্রথম পাঁচ মাসে উৎপন্ন প্রায় পঞ্চাশ কোটি গজ রেয়নবস্ত্রের মধ্যে অন্ততঃ ছাব্বিশ কোটি গজ ভারতবর্ষেই আমদানী হইয়াছে। এই বৎসরে যত রেয়ন বস্ত্র ভারতবর্ষে আমদানী হইয়াছে তাহার শতকরা নব্বই ভাগ জাপান হইতে আসিয়াছে। পঞ্জাবে ও মান্দ্রাজে রেয়নসুতা আমদানী করিয়া হাতের তাঁতে তাঁতিরা রেয়ন বস্ত্র বয়ন করে। কিন্তু জাপানের বিজলী-চালিত তাঁতের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

এখন কংগ্রেসের নির্দ্দেশমত বোম্বাইয়ের মিলগুলি রেয়নসুতা

ব্যবহার বন্ধ করিয়াছে। ইহাতে জাপানের রেয়নবস্ত্রের আমদানী আরও বাড়িয়া যাইবে। কংগ্রেস এক কারণ দেখাইয়াছেন যে, রেয়ন আমাদের রেশমশিল্পের ক্ষতি করিবে। এই ধারণা ভুল। কার্পাস, রেশম ও উলের মত রেয়ন এখন একটি চতুর্থ প্রকার বয়ন সুতার মত ব্যবহৃত হইতেছে। রেয়নের দরুণ রেশমের কম্‌তি কোথাও হয় নাই এবং হইবেও না।

আমাদের দেশেও রেয়নসুতা উৎপন্ন করা যাইতে পারে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহার কোনরূপ চেষ্টা করা হয় নাই। রেয়ন বয়ন বন্ধ করা অদূরদর্শিতার পরিচায়ক মাত্র।

যন্ত্রশিল্প বা কলকব্জা তৈয়ারি—(Mechanical Industry)

জাপানে এখন জাহাজ, রেল ও ট্রামের ইঞ্জিন ও গাড়ী, এরোপ্লেনের ইঞ্জিন ও এরোপ্লেন, ষ্টীম টারবিন্‌স্, বিজলীর যতপ্রকার ডায়নামো, ইঞ্জিন, ব্যাটারি, তার, বাতি ইত্যাদি দরকার সেই সমস্ত, সুতাকাটা ও বস্ত্রবয়ন মিল, সেতু ইত্যাদি নির্ম্মাণের সরঞ্জাম, মোটরগাড়ী, বাইসাইকেল ইত্যাদি সমস্তই তৈয়ারি হইতেছে।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দে এই শিল্পের উৎপন্নের মূল্যের পরিমাণ

জাহাজ	৪৮,৮৯৪	হাজার	ইয়েন
গাড়ী ইত্যাদি	১,০৬,০০৩	,,	,,
Pumps, Cranes, etc.	১৬,৫৭০	,,	,,
যন্ত্রপাতি	১,১৩,০৫০	,,	,,
বিজলীর যন্ত্রপাতি	৬৭,১৬০	,,	,,
Metres, Gauges, etc.	৮,৮৫৭	,,	,,
ঘড়ি, ক্লক ইত্যাদি	৯,৪০৪	,,	,,
অস্ত্রশস্ত্রাদি	২২,২৯৪	,,	,,

এই সকল কার্য্যে নিযুক্ত কোম্পানীর সংখ্যা ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ১,৪৫১ ছিল। যেখানে পঞ্চাশ জনের কম কর্ম্মী নিযুক্ত ছিল সেগুলিকে এ সংখ্যার মধ্যে ধরা হয় নাই। কর্ম্মী-সংখ্যা ছিল ৩,২১,২৪৯ এবং ইহাদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা শতকরা পঁচানব্বইয়েরও বেশী।

মোটরগাড়ী নির্ম্মাণে জাপান এখনও কিছুই করিতে পারে নাই বলিলেই হয়। যাহাতে এই শিল্প সুপ্রতিষ্ঠিত হয় তাহার জন্য গবর্ণমেণ্ট উৎসাহ দিতেছে ও সাহায্য করিতেছে।

রাসায়নিক শিল্প (Chemical Industry)

এই শিল্প হইতে উৎপন্ন হইতেছে—

Soda Ash, Caustic Soda, Bleaching Powder,

চীনামাটির ও পর্সিলেন বাসন, ইট, টালি, এনামেলের বাসন এবং পাইপ ইত্যাদি

কাচের বাসন, চিমনা ইত্যাদি

চিনি, কৃত্রিম সার (Sulphate of Amonia and Nitrogen compounds).

দিয়াশলাই, রং, সাকে (মদ্য), বীয়ার এবং সয় নামক সস্ (এই সস্ সয়বিনের বীজ হইতে প্রস্তুত হয় এবং বহু পরিমাণে ব্যবহৃত হয়)।

কাগজ প্রস্তুতের জন্য পাল্প এবং কাগজ—পুস্তক, পত্রিকা ইত্যাদি ছাপা ব্যতীত ঘরের দেওয়ালে, রুমাল রূপে, হাতপাখায়, এবং নানারূপে কাগজের ব্যবহার হয়। প্যাকিং কাগজ, রুমাল ইত্যাদি ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ২৯,৪০,২২৬ ইয়েনের এবং ৫,৮২,৬০৭ ইয়েন মূল্যের পাখা বিদেশে চালান দেওয়া হয়। কাগজের সরু ফিতা হইতে হ্যাট হয়।

সেলুলয়েড্ বা গাটাপাচার খেল্না ইত্যাদি ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ১,৬৫,৪৩,০০০ ইয়েনের উৎপন্ন হয়।

চামড়া কষ-করণ ও চামড়ার জিনিষ প্রস্তুত

ইসিংগ্লাস্ নামক দ্রব্য ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে ৪২,৪৩,০০০ ইয়েনের প্রস্তুত হইয়া বিলাত ও আমেরিকায় চালান যায়। জ্যাম প্রস্তুত করিতে ইহার ব্যবহার হয়।

রবারের জিনিষ, টায়ার টিউব, পাইপ ইত্যাদি প্রস্তুতের পঞ্চাশটি কারখানা আছে এবং ১৯২৮ সনে ৭,০২,৭০,৫০০ ইয়েনের দ্রব্য উৎপন্ন হয়। জাপান বিদেশী জিনিষের উপর ট্যাক্স বসাইয়া এই শিল্প গঠনে সাহায্য করিয়াছে। রবার উৎপন্ন করিবার জন্য মালয় দ্বীপপুঞ্জে জাপানীদের রবারের চাষ চলিতেছে।

ল্যাকার বা গালার জিনিষ,

মৎস্য, সীম বীজ এবং তিমির তৈল জমাইয়া সাবান প্রস্তুতের জন্য কাঁচা মাল। ইহা বিদেশে চালান হয়।

সাবান প্রস্তুতের জন্য অনেক বড় বড় কারখানা আছে, তাহাদের উৎপন্নের মূল্য ১৯২৮ সনে ৩,৭৯,০১,০০০ ইয়েন। চীন, মাঞ্চুরিয়া এবং প্যাসিফিক্ দ্বীপপুঞ্জে এই সকল চালান হয়।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ৪৮,৫১,০০০ ইয়েন মূল্যের মেন্থল ও পিপারমেণ্ট তৈল উৎপন্ন হয় এবং ২২,৭৬,০০০ ইয়েন মূল্যের এই পণ্য বিদেশে চালান যায়।

বিজলী উৎপাদন

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে বিজলী উৎপাদনের প্রথম কারখানা কয়লা দিয়াই চালিত হইত। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে কীওতোর নিকট খাল কাটিয়া

পরিশিষ্ট গ

প্রথমে জলের সাহায্যে বিজলী উৎপাদিত হয়। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে পঞ্চাশ মাইল দূর হইতে এবং ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে দেড়শ' মাইল দূর হইতে জল-প্রবাহের সাহায্যে উৎপাদিত ১,১৫,০০০ ভোল্ট বিজলী টোকিওতে সরবরাহ করা হয়। ইহার পর জল-প্রবাহ দ্বারা বিজলী উৎপাদন বা হাইড্রো-ইলেকট্রিক্ কার্য্য দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এখন সকল নদীর জলস্রোতের সাহায্যে বিজলী উৎপাদিত হইতেছে বা উৎপাদনের চেষ্টা হইতেছে। বিজলীর ব্যবহার ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে। আলোক ছাড়া সকল শিল্পেই এখন বিজলী দ্বারা যন্ত্রপাতি এবং রেল, ট্রামও চালিত হইতেছে। কৃষিকার্য্যেও বিজলীর ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে।

বিজলী উৎপাদনের জন্য বড় বড় কোম্পানীর চলন হইয়াছে। ছোট ছোট কোম্পানী বড় বড় কোম্পানীর সহিত মিলিত হইয়া কাজ করিতেছে। এই কার্য্যে জাপানের অপর শ্রমশিল্প অপেক্ষা বেশী টাকা নিয়োজিত হইয়াছে।

বিজলী উৎপাদনের সহিত ইলেক্‌ট্রো-কেমিক্যাল কার্য্যের বিস্তার হইয়াছে। ইহা দ্বারা galvanised copper, calcium carbide, nitrogen-fertilizers, alloy, cement, bleaching powder, pottasium chlorate প্রভৃতি উৎপাদিত হইতেছে। এই সকল উৎপন্নের মূল্য ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ১৪,৩৫,৮৩,০০০ ইয়েন হইয়াছিল।

গ্যাস

বিজলীর চলনহেতু আলোকের জন্য গ্যাসের ব্যবহার কম হইয়াছে মনে হইতে পারে, কিন্তু জাপানে রন্ধনের জন্য গ্যাসের চলন হওয়ায় গ্যাস-উৎপাদন কার্য্য না কমিয়া বাড়িয়াই চলিয়াছে। গ্যাস-উৎপাদনের সঙ্গে কোক্ ও আলকাতরা পাওয়া যায়।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দে গ্যাসের কারখানা ছিল আটাত্তরটি, ইহাদের মূলধন—৩১,৮৭,৯৮,০০০ ইয়েন।

অপরাপর শিল্প

টিনে রক্ষিত মাংস, মৎস্য, কাঁকড়া, ফল ও তরিতরকারী ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ২,৩৩,৪৩,০০০ ইয়েন মূল্যের উৎপন্ন হয় এবং বহু পরিমাণে বিলাত ও আমেরিকায় চালান যায়।

জমান দুগ্ধ (condensed milk) উৎপাদনের জন্য গবর্ণমেণ্ট সাহায্য করিতেছে। বিদেশী দুগ্ধের উপর ট্যাক্স বসান আছে এবং দেশী কারখানাকে তিন বৎসরের জন্য আয়কর দিতে হয় না ও যে-চিনি ব্যবহৃত হয় তাহারও কর লওয়া হয় না। ১৯২৮ সনে ৭১,৮৮,০০০ ইয়েন মূল্যের দুগ্ধ দেশে উৎপন্ন হইয়াছিল এবং ২৯,৯৫০০০ ইয়েন মূল্যের দুগ্ধ বিদেশ হইতে আমদানী হইয়াছিল।

খেলনা—সেলুলয়েড, টিন, রবার, কাঠ, কাপড়, কাগজ, মাটি, পর্সিলেন, চীনা মাটির খেলনার জন্য এখন অনেক কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহা হইলেও গৃহশিল্পরূপে এখনও বহু খেলনা প্রস্তুত হয়। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ১,৩৮,৫৫,০০০ ইয়েন মূল্যের খেলনা বিদেশে চালান যায়।

ঘড়ি—ওয়াচ ও ক্লক—নির্ম্মাণের অনেক ছোট ছোট কারখানা আছে।

খড় দিয়া ষ্ট্র হ্যাট এবং টুকরা কাঠ ও হেম্প দিয়া বেণী তৈরি হয়। জাপানে গ্রীষ্মকালে ষ্ট্র হ্যাটের সর্ব্বত্র চলন হইয়াছে। ১৯২৮ সনে ৫১,৮৬,০০০ ইয়েন মূল্যের এই সমস্ত জিনিষ বিদেশে চালান দেওয়া হয়।

১৯২৯ খৃষ্টাব্দে মোজা গেঞ্জি, দস্তানা ও গেঞ্জির পা-জামা ইত্যাদি

৩,৬৭,১১,০০০ ইয়েন মূল্যের চীন, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা এবং প্যাসিফিক্ দ্বীপপুঞ্জে চালান যায়।

মাদুর ও চাটাই বুনন কৃষকদিগের উপশিল্প। এখন এই সকলও পরীক্ষা করিয়া তবে চালান দেওয়া হয়। ১৯১৮ সনে ৫১,০৭,১২৬ ইয়েন মূল্যের মাথার ও নখ পরিষ্কার করা এবং দাঁতমাজা বুরুষ উৎপন্ন হয় এবং অনেক চালান যায়। য়্যানথ্রাক্স নামক রোগের বীজাণু বহন করে বলিয়া দাড়ি কামাইবার জন্য জাপানী বুরুষের ব্যবহার এখন ইংলণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া ও ভারতবর্ষে বন্ধ হইয়াছে।

বোতাম—প্রায় অর্দ্ধেকের উপর ঝিনুক হইতে তৈরি। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ ইংলণ্ড ও আমেরিকায় ১৬,৩৫,৭০৫ ইয়েন মূল্যের চালান যায়।

	উৎপন্নের মূল্য (ইয়েন) ১৯২৮ খৃষ্টাব্দ	বিদেশে চালানের মূল্য (ইয়েন) ১৯২৯ খৃষ্টাব্দ
এনামেলের জিনিষ	৮৮,১৪,৮৭১	৬৭,০৭,২৭২
কাঠের বাক্স ইত্যাদি	২০,৩৩,২২,৯৯০	৩৫,৯২,৮৪৩
বাঁশের টুকরী, বাক্স-পেটরা	১,৪০,২৬,০২১	১৫,০২,৪১২
হাতপাখা	৩,৮৯,১৩১	৫,৮২,৬০৭
চামড়ার জুতা, ব্যাগ ও স্যুটকেশ ইত্যাদি	৩,২০,৯৫,৯২৬	৭,৮৮,৫৯৬
দাঁতের মাজন, পাউডার, মাথার তেল, ক্রিম, এসেন্স ইত্যাদি	২,৮৬,২০,৫৩৫	২৯,৯৭,২৬৭
বেতের বাক্স ইত্যাদি	৪২,৩২,১২৮	৩,২৮,৭৮০
বিজলীর তার	৯,২৮,০৮,৩৬৭	৩৫,২৯,১১৪

ব্যাঙ্ক—১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম জাতীয় ব্যাঙ্ক স্থাপন করা হয় এবং ১৮৭৯

খৃষ্টাব্দের মধ্যে জাতীয় ব্যাঙ্কের সংখ্যা একশ' তিপ্পান্ন হয়। তখন সকলেই ব্যাঙ্কনোট ছাপাইতে পারিত। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে আধা-সরকারী জাপান ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয় এবং ইহাকেই নোট ছাপিবার ক্ষমতা দেওয়া হয়। ইহার পর exchange bank, colonisation bank, agricultural এবং industrial bank স্থাপিত হয়। প্রথমে স্থাপিত জাতীয় ব্যাঙ্কগুলি ক্রমে ক্রমে উঠাইয়া দেওয়া হয়। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে জাপানে যে সকল ব্যাঙ্ক ছিল সে সকল ব্যাঙ্কের সংখ্যা নীচে দেওয়া গেল—

কৃষি ও শিল্প (Agricultural and Industrial Banks)	২৪
সাধারণ ব্যাঙ্ক	৯৭৬
বিশেষ ব্যাঙ্ক	৮

—এই সকল ব্যাঙ্কের শাখা প্রায় ছয় হাজার আছে। ইহা ছাড়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রায় এক হাজারের উপর নানা ব্যাঙ্ক আছে।

দরিদ্রদিগের মধ্যে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে ১৮,০৮৪টি বন্ধকী দোকান (pawn shops) ছিল। তিন হইতে ছয় মাস পর্যন্ত বন্ধক রাখা হয় এবং সুদের হার বৎসরে শতকরা কুড়ি হইতে আটচল্লি শ ন পর্যন্ত।

ঐ সনে নানা স্থানে একচল্লিশটি সাধারণ বন্ধকী দোকান (public pawn shop) ছিল। কোন-না-কোন জনহিতকর সমিতি দ্বারা এইগুলি পরিচালিত হইত এবং ইহাদের সুদের হার কম।

— জাপানের অনেক স্থানে "মুজিন্" প্রথা আছে। হয়ত পঞ্চাশ জনে মিলিয়া মুজিন্ সমিতি গঠন করিল। প্রতিমাসে প্রত্যেকে যদি এক টাকা করিয়া দেয় তবে পঞ্চাশ টাকা উঠে এবং লটারী করিয়া যাহার নামে উঠে সে এই টাকা পায়। সকলেই এই টাকা পাইয়া গেলে সমিতি বন্ধ হইয়া যায়। এই ব্যাপারে অনেক সময় লোকে ঠকিত বলিয়া গবর্ণমেণ্ট এগুলি পরিচালনার নিয়ম করিয়া দিয়াছে।

ঐ সকল ছাড়া সমবায় সমিতির জন্য একটি বৃহৎ কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক আছে।

এগারটি বিদেশী ব্যাঙ্কের চব্বিশটি শাখা জাপানের বড় বড় শহরে আছে।

এখন জাপানে ইন্‌সিয়রেন্স বা বীমা কোম্পানী আছে—জীবনবীমার দশটি, অগ্নি বীমার দশটি এবং সামুদ্রিক বীমার দশটি।

ব্যবসা

১৯৩০ খৃষ্টাব্দে নব্বইটি চেম্বার অফ্ কমার্স বা ব্যবসা-সংসদ্ বা ব্যবসায়ীদের সমিতি ছিল এবং ইহাদের সভ্যসংখ্যা ছিল ৩৯১০। এই সমিতিগুলি টোকিও কেন্দ্রীয় চেম্বার অফ্ কমার্স য়্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীর সভ্য। বাঙ্গালা দেশ সম্বন্ধে আমি যত দূর জানি মাত্র তিনটি ব্যবসায়ী সমিতি আছে, যথা—সাহেবদিগের বেঙ্গল চেম্বার অফ্ কমার্স, দেশীয়দের ন্যাশান্যাল চেম্বার অফ্ কমার্স এবং মাড়োয়ারী চেম্বার অফ্ কমার্স।

শিল্প ও ব্যবসার সুবিধার জন্য জাপানে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে উনচল্লিশটি এক্সচেঞ্জ ছিল এবং ইহাদের দালালের সংখ্যা ছিল ৯৩৭। রেশম এক্সচেঞ্জের উদাহরণ দিয়া ইহাদের উপকারিতার পরিচয় দিতেছি। রেশম এক্সচেঞ্জে আজ একজন কোন বিশেষ নমুনার রেশমসুতা বিক্রয় করিল। নিয়ম হইতেছে এই সুতা ছয়মাসের মধ্যে ক্রেতাকে দিতে হইবে। এখন বিক্রেতা কি দরে গুটী কিনিয়া সুতা তৈয়ারি করিতে পারে বুঝিতে পারিল এবং সেই মত কাটাই কারখানাতে কাজ সুরু করিল। ইতিমধ্যে যদি দাম চড়িয়া যায় তাহা হইলে বিক্রেতা

নিজের বিক্রীর কণ্টাক্ট এক্সচেঞ্জে বিক্রয় করিয়া দিতে পারে। এই রূপে যত ক্রয়-বিক্রয় হয় তাহার একশতের মধ্যে মাত্র প্রায় পাঁচটিতে মাল সরবরাহ হয় এবং বাকী কণ্টাক্টগুলি হস্তান্তরিত হয়। এইরূপে ষড়যন্ত্র করিয়া বা অন্যায় ব্যবহার দ্বারা দাম চড়িয়া যাইতে পারে। যাহাতে এইরূপ না হয় তাহার জন্য বহু নিয়মকানুন আছে। এইরূপ এক্সচেঞ্জ কারবার করিয়া না-কি জয়েণ্ট ষ্টক্ কোম্পানীর স্থান পূরণ করা যায়। এ সম্বন্ধে আমার বিশেষ অভিজ্ঞতা নাই। ইয়োকোহামার রেশম এক্সচেঞ্জের কাজ বুঝিবার চেষ্টা করিয়া যে ধারণা জন্মিয়াছে তাহাই এখানে বিবৃত করা যাইতেছে।

জাপানের এক্সচেঞ্জ এখন আমেরিকার নিউ ইয়র্কের এক্সচেঞ্জগুলির নমুনায় গড়িয়া তুলিবার জন্য আইন করা হইয়াছে। নানাবিধ জিনিষের কণ্টাক্ট পূরণের সময় ভিন্ন। ধান ও গমের জন্য তিন মাস, রেশমসুতার ছয় মাস, সীমের খৈলের পাঁচ মাস, কার্পাস, কার্পাসের সুতা এবং কাপড়ের জন্য এক বৎসর। ষ্টক এক্সচেঞ্জের সময় তিন মাস।

ব্যবসায় উন্নতির উদ্দেশ্যে বড় বড় কেন্দ্রে মাল রাখিবার সুবিধার জন্য নিরানব্বইটি গুদাম তৈরি হইয়াছে। এই সকল গুদামে অল্প ভাড়ায় মাল গচ্ছিত রাখা হয় এবং ইন্সিয়র্ করা হয়। ধান, গম, সুতা, কাপড়, কার্পাস, রঙ ইত্যাদি যাবতীয় ব্যবসায়ের জিনিষ এই সকল গুদামে রক্ষিত হয় এবং দেশে বা বিদেশে চালান দেওয়া হয়।

শিল্প ও ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য জাপানে সম-ব্যবসায়ী ও সম-উৎপাদনকারীদের "গীল্ড আইন" পাস করা হইয়াছে। কোন স্থানের কোন জিনিষ উৎপাদনকারীদের অর্দ্ধেকে মত করিলেই গীল্ড স্থাপন করা হয় এবং সকলেই গীল্ডে যোগদান করিতে বাধ্য। গীল্ডের উদ্দেশ্য হইতেছে, উৎপাদন-প্রণালীর গ্লানি এবং উৎপন্নের দোষ-ত্রুটি দূর করিয়া

উন্নতি সাধন করা। যাহারা বিদেশে মাল চালান দেয় তাহাদের প্রায় সকলেরই গীল্ড আছে।

শিল্প ও ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য কমার্সিয়াল মিউজিয়মগুলিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাতে স্বদেশী বিদেশী নানাবিধ মালের নমুনা আছে। ইহা ছাড়া মিউজিয়মগুলি ব্যবসা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে এবং অনুসন্ধানের ফল প্রচার করে এবং স্বদেশী উৎপাদনকারী ও বিদেশী ব্যবসাদারদের সহিত সংযোগ স্থাপন করে।

দেশের শিল্পদ্বারা উৎপন্নের যাহাতে ক্ষতি না হয় সেইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া বিদেশ হইতে আমদানী মালের উপর কোন কোন ক্ষেত্রে জিনিষের যত দাম তত ট্যাক্স আদায় করা হয়। আবার যে সকল কাঁচা মাল বিদেশ হইতে আমদানী করিয়া দেশে ব্যবহৃত হয় তাহাদের উপর ট্যাক্স নাই। রেশমশিল্পের উন্নতির জন্য যে-সব বস্ত্র বিদেশে চালান দেওয়া হয় তাহার উপর ট্যাক্স নাই, কিন্তু দেশে ব্যবহৃত কাপড়ের উপর ট্যাক্স আছে। এই সমস্ত শুল্কের বিবরণ দেওয়া এখানে প্রয়োজন মনে করি না।

১৯২৯ খৃষ্টাব্দে জাপান হইতে রপ্তানি দ্রব্যের মূল্য ছিল ২,১৪,৮৬,১৮,০০০ইয়েন এবং আমদানীর মূল্য ২,২১,৬২,৪০,০০০ ইয়েন। ঐ সালে ভারতবর্ষ হইতে আনীত দ্রব্যের মূল্য ছিল ২৮,৮১,০৪,০০০ ইয়েন এবং ভারতবর্ষে প্রেরিত দ্রব্যের মূল্য ছিল ১৯,৮০,৫৭,০০০ইয়েন।

বিদেশী বাণিজ্য জাপানীরা কতদূর নিজেদের হাতে রাখিয়াছে কত জাহাজ বন্দরে আসিয়াছিল তাহা হইতে প্রকাশ পায়। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে ১৮,২৩১খানি জাহাজের মধ্যে ১৪,০৮৬খানি ছিল জাপানী।